প্রকাশক
ব্রজবিহারী বর্মণ
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২ হ্যারিসন রোড
কলিকাতা

প্রচ্ছদশিল্পী—মণি মিত্র
এপ্রিল,
১৯৫০

মুদ্রাকর
রাখালদাস চক্রবর্তী
শিবির প্রেস
১৩।২বি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

দেড় টাকা]

সহধর্মিণী, সচিব এবং সখা—সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণীও বটেন। একথা ধূসর অতীতে নানা রঙে-রসে জারিয়ে উপহার দিয়েছেন কবিরা—কিন্তু তবু পুরুষের প্রভুত্বের দাপট তারই আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে। 'ওডিসী'তে হেক্টরের সেই অ্যান্ড্রোম্যাকির প্রতি উক্তি—'যাও, চরকা নিয়ে বসগে'—আর যাই হোক্ নারীর পক্ষে সম্মানজনক নয়। আজ ধনবাদের আওতায় সেকথা আরো বেশি করে খাটে। তাই দেশে দেশে দেখি নারী-আন্দোলন। কোথাও শ্রীযুক্তা প্যাঙ্কহার্স্ট তার পুরোধা—কোথাও-বা হালিদা খানুম—কোথাও-বা সরলা দেবী। দেশে দেশে তারা সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। কিন্তু সমান অধিকার পাননি। নিক্তি এখনো পুরুষের দিকেই হেলে আছে। এরই মধ্যে ফ্যাসিজমের নবন্যায় আবার গৃহস্থালীর সংকীর্ণ গণ্ডীতে তাদের আবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছে। নারী-আন্দোলনের ইতিহাস মোটামুটি এই।

এরই ওপিঠে সোভিয়েৎ রাশিয়া। রুশ-বিপ্লব এনে দিয়েছে নারীর সম্পূর্ণ মুক্তি—দিয়েছে তাকে সমান অধিকার। জারের শাসনে তারা ছিলেন ঘটি-বাটির সামিল—স্বামীর সম্পত্তি। কিন্তু সে রুদ্ধ দুয়ার একদিন ভেঙে পড়লো বিপ্লবের আঘাতে। লেনিন শোনালেন মুক্তির বাণী, তিনি বললেন—মেহনতি মানুষের অর্ধেক যদি থাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে—তাহলে সাম্যবাদের জয়লাভ তো অসম্ভব। তাদের মুক্তি দিতে হবে, দিতে হবে স্বাধিকার। মেয়েরা মুক্তি পেলেন—সাড়া জাগলো। বাইরের পৃথিবী ব্যঙ্গে ধূম হয়ে ওঠলো—কুৎসিত আক্রমণ করলো। কিন্তু মেয়েরা চললেন এগিয়ে। তারা কারখানায়, থিয়েটারে—রাষ্ট্রের নানা দপ্তরে ছড়িয়ে পড়লেন—তাদের আমরা যুদ্ধের পটভূমিকায় দেখলাম,

গেরিলাবাহিনীর অধ্যক্ষ, ইঞ্জিন-চালক আর বৈমানিক রূপে। কোথায় না দেখলাম তাদের ?

তাঁদেরই কাহিনী লিখেছেন কেটায়েভ। বাস্তবকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর কলমে। মেয়েরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, কাজ করছেন—কিন্তু হৃদয়ের সে চিরন্তন কোমলতা হারাননি। স্বামী হারিয়ে তারা কাঁদছেন—কিন্তু কান্নার বন্যায় ভেসে যায়নি মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য। এমনি মেয়ে আজ দেখতে পাচ্ছি মুক্ত চীনে, ভিয়েৎনামে—আমাদের দেশের সুদূর পল্লিতে পল্লিতে। এমনি মেয়েই আজ সংগ্রামী মানুষের কামনা। তারাই তো প্রকৃত সহধর্মিণী।

অশোক গুহ

[এক]

এবরো-খেবরো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে হালকা ট্রাকটা, বাক্সের ভিতর কামানের গোলাগুলো ঝক্‌ঝক্ শব্দ করছে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছি, প্রতিমুহূর্তে একপাশে ছিট্‌কে পড়ার ভয়। গাড়িগুলো যেতে যেতে ধুলো ওড়াচ্ছে আর পথের ওপর ভাসছে ধুলোর ঘন আস্তরণ। ধুলোর তপ্ত মেঘের ভিতর দিয়ে আমরা জোরে ছুটে চললাম। টুপিটা টেনে নামিয়ে দিলাম, কিন্তু ধুলো থেকে তো রেহাই পেলাম না। বরং এবার আরো গরম লাগল, কপাল থেকে ভ্রূ বেয়ে ঝরে পড়ল ঘাম। আমাদের ট্রাকটা বার্চ গাছের ডালপালার ছদ্ম আবরণে ঢাকা, যখনই হাত পড়ছে, ধুলোর কণা উড়ে এসে পড়ছে চোখে।

আকাশে ধূসর জলহীন মেঘের চাঁদোয়া—একেবারে ঠাস বুনোট, চার পাশে রাই শস্যের ঘন ক্ষেত—দিগন্তে মিশে গেছে। গাছগুলো খুব বড় বড়, কোথাও-বা শস্য মাড়িয়ে পিষে ফেলা হয়েছে।

মাঝে মাঝে আকাশে দেখা যাচ্ছে জার্মান বোমারু বিমান, কখনো-বা ছ'খানা, কখনো-বা ন'খানা একত্রে। আমাদের ট্রাক-চালক ছোকরা, কর্পোরাল। সে স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধে সামরিক সম্মান পেয়েছে, বোমারু বিমান দেখে সে ফুলে উঠছে রাগে, গাড়ি থেকে বার বার মাথা বার করে দেখছে, জ্বলছে চোখ দু'টো। নিঃশব্দ ক্রোধে গীয়ার বদলাচ্ছে, পা দিয়ে চাপছে থ্রট্‌ল্। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি লাফিয়ে উড়ে চলেছে সামনে। নিচ থেকে উঠছে ধুলোর উত্তপ্ত ঢেউ, বিস্ফূর্ত

হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ট্রাকের ভিতরে, ঝলক ঝলক ধুলো যেন অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে রাই গাছগুলির ওপর আর পথের পাশে উঁকিঝুঁকি মারছে।

ট্রাক যেখানেই থামছে, ক্রুদ্ধ চালক বালতি থেকে ফুটন্ত র‍্যাডিয়েটরে ঢালছে জল আর পশ্চিমদিক থেকে আসছে একসঙ্গে বহু কামানের শব্দ।

ওরেল অভিযানের আজ তৃতীয় দিন। ট্যাঙ্কের প্রধান ঘাঁটি থেকে দুপুরে বেরিয়েছিলাম। আশা ছিল সন্ধ্যের আগেই ঐ পথে কোনো ট্রাক ধরে সীমান্তে পৌঁছে যাব। কিন্তু সেনাবাহিনী এখন চলার মুখে, তাই ছকমাফিক ঘোরা আমার হোল না। পথে বহু গাড়িই যাচ্ছিল, কিন্তু আমার পথে যাবে এমন গাড়ি একটিও পেলাম না। কেউ কেউ তবু আমাকে তুলে নিল, কয়েক মাইল নিয়ে গিয়ে দিল নামিয়ে, এবার তারা অন্য পথে যাবে। আবার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম হাত তুলে। সে এক অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা! এমনি করে চারবার গাড়ি বদলেছি, হেঁটেছিও মাইল চারেক। তারপর বরাত ফিরল। একসার ট্রাক পেয়ে গেলাম, আমার গন্তব্যস্থানের দিকেই তারা চলেছে।

আঁধার হয়ে এল। সীমান্তের যত কাছে আসছি, ততো ভীষণ হয়ে উঠছে পরিবেশ। প্রতি পদক্ষেপে গতকালের যুদ্ধের চিহ্ন উঠছে আরো ফুটে। বাতাসে আসছে পরিত্যক্ত শবের দুর্গন্ধ, জুলাইয়ের গরমে মৃতদেহগুলি খুব তাড়াতাড়ি পচে উঠছে। জার্মান কামান আর পুড়ে-যাওয়া গোলাবারুদের গাড়ির আশেপাশে খালি কার্তুজের বাক্সগুলি স্তূপাকারে পড়ে আছে। পিষে-যাওয়া রাই ক্ষেতে দু-একটা জার্মান সৈন্যের দেহ চোখে পড়ছে, চোখে পড়ছে বুকে আঁকা হলদে আর কালো ক্রশ-চিহ্ন। চারদিকে ভাঙাচুরো শিরস্ত্রাণ, কার্তুজ-বন্ধনী আর বুলেট-ছিদ্র লোহার পিপে। ধুলো-ভরতি ঝোপোঝাড়ে ঝুলে আছে ধূসর-সবুজ উর্দির টুকরো-টাকরা। এমন এক ইঞ্চি জমি নেই যেখানে

যুদ্ধ তার করাল ছাপ রেখে যায় নি।

আমার মনে পড়ছে ধ্বংসীভূত গ্রামের বাইরের এক ফালি জমির কথা। গ্রামের আর কিছু নেই, শুধু ছাইয়ের গাদা, আগুন এখনো আছে তলায়। একটি চিমনিও ধ্বংসের প্রতিবাদ হিসেবে সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। সব সমভূমি হয়ে গেছে। একটা আগুন-ঝলসানো কালো গাছ সেই ধ্বংসস্তূপের উপর হেলে পড়েছে, নিচে নিবন্ত আগুনের মিউনো আলো। আর এক টুকরো জমিতে দেখলাম, ছাইও নেই, দেখলে মনে হবে না, আগুন লেগেছিল। মরা জমি, কালো পাথরে পরিণত, লাভার বন্যা বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। এই মরা, পাথুরে জমির উপর সটান লম্বা হয়ে পড়ে আছে দু'টি জার্মান সৈন্যের দেহ, ফুলে উঠেছে। দেখলে মনে হয়, আলকাতরার তৈরি, শুধু চোখের মণি দু'টো শাদা, লাল চুল পুড়ে গেছে, রক্ত জমে মাটির সঙ্গে লেগে আছে চুলগুলি। চারটে ট্যাঙ্ক একটার উপর একটা অদ্ভুতভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে— তাদের মধ্যে তিনটে জার্মানদের আর একটা আমাদের। আমাদের ট্যাঙ্কটার ছাদের উপরের ফাঁকা দিয়ে বুটশুদ্ধ একখানা পা বেরিয়ে আছে, বুটের তলাকার ঝকঝকে কাঁটাগুলো দেখা যাচ্ছে। জার্মানদের একটা গাড়ি-টানা বুড়ো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার সর্বাঙ্গে মাছি, পা দু'টো কাঁপছে, খুর দু'ভাগ হয়ে গেছে—ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। এক পা এগোবারও সাধ্য নেই, গাড়িগুলোকে বেঁকে যেতে হচ্ছে।

তিনটি চাষী, বুড়ো-বুড়ি আর একটি যুবতী, তার কোলে একটি শিশু, একটা গোরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে একটা লোহার চার চাকাওলা গাড়ি—গাড়িতে বহু পুঁটলি রয়েছে। মৃতদেহগুলো মাড়িয়ে তারা চলেছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে জিজ্ঞাসু-

দৃষ্টিতে। তারা এই মৃতের এলাকা তাড়াতাড়ি পার হয়ে চলেছে।

গ্রামটার ঠিক বাইরে চৌরাস্তার মোড়, একটি সুশ্রী যুবতী একটা ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে হাত তুলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। নীল রঙের কোট তার, কোটের হাতা বেশ ঢিলে, সৌখীন ডোরা কাটা রুমাল—বেশ ছিমছাম বেশভূষা, কেউ দেখেই বুঝতে পারবে, মেয়েটি অকূলে পড়েছে। তার পা থেকে মাথা অবধি ধূলোয় না ভরে গেলে মনে হোত মস্কো-এ স্বার্দলভস্কোয়ারে সে বাস ধরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের চালক আর যাত্রী নিতে রাজি নয়। সে মেয়েটিকে দেখেও না দেখার ভাণ করে চালাতে লাগল। আমি হাত-তালি দিয়ে কয়েকবার সঙ্কেত করলাম, এবার সে ব্রেক কষল।

মেয়েটি এবার কাছে এসে তাকে তুলে নিতে অনুরোধ করল।

কোথায় যাচ্ছেন? জিজ্ঞেস করলাম।

দেখুন না, কোথায় যে যাব ঠিক জানি না, মেয়েটি অপ্রতিভ হাসি হাসল, আমি সেনাবাহিনীর একটা বিশেষ ঘাঁটিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন তো সবাই চলার মুখে। কেউ কোনো হদিশ দিতে পারছে না। সেই সকাল থেকে পথে পথে ঘুরছি, কিন্তু এখনো কোথাও পৌছতে পারলাম না। আপনি হয় তো ঘাঁটির খবর জানেন?

মেয়েটি আমাকে একটা ফিল্ড্ পোষ্টাফিসের নম্বর দিল।

জানি না তো!

কি করব বলুন তো? তার স্বরে হতাশা।

আপনি কি স্বেচ্ছাসেবিকা? নিজের কাজে ফিরে চলেছেন বুঝি?

না, আমি আমার স্বামীর সমাধি দেখতে যাচ্ছি। গত বছর মার্চে তিনি সীমান্তে মারা গেছেন। এতদিন সেখানটা ছিল শত্রুর অধিকারে, কিন্তু এবার তো অভিযান শুরু হয়েছে, এবার—

আপনার অনুমতিপত্র আছে ?

ওঃ এই যে, দেখুন।

মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ খুঁজে বার করে আমার হাতে দিল। সীমান্তের প্রধান সামরিক ঘাঁটি থেকে নিনা পেত্রভনা ক্রস্তালেভার নামে ছাড়পত্র।

হাঁ, ঠিকই আছে, কিন্তু কোন্ ঘাঁটিতে যাবেন আপনি ?

আমার স্বামী ছিলেন একেবারে সুমুখের দলের সেনাপতি, সেখানে আমার বহু বন্ধু আছেন। এখন সেখানে পৌছানোটাই হচ্ছে আসল কথা। তারপর·········এখন আমি ভাবতেও পারছি না কি হবে। এতো এক পাগলামি। তার ধূসর চোখে চঞ্চলতা—ভয়ের থেকে সেখানে পড়েছে দুঃখের ছায়া।

আপনিই বলতে পারবেন, আমি কি করব ?

প্রধান ঘাঁটিতে আমি যাচ্ছি। সেখানে ওরা নিশ্চয়ই এই দলের খবর রাখে। যদি তা হয়, তাহলে ওরা ফোনে যোগাযোগ করে দেবে। আপনি যাচ্ছেন, এ কথা কেউ জানে ?

হাঁ, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

তাহলে আমাদের সঙ্গে আসুন।

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মেয়েটি কোটটা তুলে ধরে চাকার উপর এক পা রাখল আমি তার হাত ধরে তাকে ট্রাকে তুলে নিলাম। সে ব্যাগটা পেতে বসে পড়ল আমার পাশে। পিঠ চালকের সীটে হেলান দিয়ে, পা রাখল কামানের গোলার একটা বাক্সের উপর। আবার রওনা হলাম। গাড়ি পথের গর্তগুলোর উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করল। ধুলোভরা আকাশে হলদে চাঁদ যেন রুদ্ধশ্বাস, দিগন্তে আগুনের লাল আভাষ: জার্মানরা

গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দিয়ে পিছু হঠ্ছে। তারই চিতাবহ্নি দেখতে পাচ্ছি। ধোঁয়ার কটু গন্ধের সঙ্গে মৃতদেহের পুতি-গন্ধ মিশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, নাকে এসে লাগছে। মাঝে মাঝে শস্যের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে, এই তাণ্ডব এড়িয়ে মাঠের যে কটা শস্যের ফুল বেঁচে আছে তারই সুগন্ধ।

নিনা পেত্রভ্না এবার নিস্তব্ধতা ভাঙলো। গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে উঠল তার স্বর: এই আমাদের প্রিয়ভূমি ওরেল। রাশিয়ার আত্মা। ভাবুন একবার! ঐ বর্বর হুনের দল—আজ তার এই অবস্থা করেছে। আজ সে মরুভূমি। হত্যার প্লাবন বয়ে গেছে। ওরা এখানে কেন এসেছে? ওদের কি অধিকার? না, না, আমরা ওদের এই অনধিকার প্রবেশ সহ্য করব না। এসব দেখলে বা শুনলে কে না পাগল হবে। আমাদের দেশের কি দুর্দশা করেছে এই ঘৃণ্য পশুর দল!

সে তার হাত মুঠো করল। তার সুন্দর ধুলোমাখা মুখখানা আমার দিকে ফেরালো—চোখ দুটোয় দিগন্তের আগুনের রক্তাভ ছায়া।

আমি ওদের সৌভাগ্যে হিংসে করি না। সে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল, কঠোর হয়ে উঠেছে তার মুখখানা। তারপর ব্যাগ থেকে একখানা রুমাল বার করে মুখ ঘসতে লাগল। চোখের কোণ থেকে ধুলো ঘসে বলল, ওরা এর ফল ভোগ করবে। আমাদের প্রিয়ভূমির বুকে প্রতিটি কলঙ্ক রেখার মূল্য ওরা দিয়ে যাবে। আমাদের প্রতিবিন্দু চোখের জলের দাম ওদের দিতে হবে। সে সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। হাঁ—প্রতিটি বিন্দু চোখের জলের দাম!

[দুই]

রক্তিম আকাশ তেমনি উজ্জ্বল, রক্তিম আলো মেঘের ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে। পশ্চিম দিগন্তে হরিদ্রাভ ঔজ্জ্বল্য কেমন অস্বাভাবিক যেন। দূরে সীমান্ত রেখা, আলোক মালা সুসজ্জিত পথের মতোই ঝিকমিক করছে। আমরা এবার মোড় ঘুরলাম, অন্ধকার সরু পথ। এখানে রহস্যময় পরিবেশ, দ্রুত আঁধারের ভিতর চলেছে মানুষ, কামান আর ট্যাঙ্ক। হঠাৎ ট্রাকটা থেমে গেল। চালক নেমে চারদিক দেখতে লাগল।

হ্যাঁ, এই জায়গাই বটে। সে বলল।

আমরা নেমে হাঁটলাম একটু, পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। তিনটি কালো মূর্তি আমাদের কাছে এগিয়ে এল, তাদের কাঁধে টমিগান। এক মুহূর্তের জন্য এক ঝলক আলো এসে পড়ল আমাদের উপর, তারপর হাঁক শোনা গেল!

প্রধান ঘাঁটির রক্ষী, অনুগ্রহ করে সংকেত জানাও।

তালা—বললাম আমি।

কোথায় আপনি যেতে চান, কমরেড লেফটেনান্ট-কর্ণেল ?

নেকায়েভ্ বাহিনীতে।

এই সেখানেই এসে গেছেন।

আমাকে অধ্যক্ষের কাছে নিয়ে চল।

আর মেয়েটি ?

আমার সঙ্গী।

সরু পথ, আলো নেই, শুধু চাঁদের আলো আর ছায়ার ভিড়। যেদিকে

ছায়া সেইদিকেই আমাদের ওরা নিয়ে চলল। একটু ঢালু হয়ে এসেছে পথ, যেন জ্যোৎস্না-ভরা আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। ঢালু পথের মাঝখানে একটা ঝোপ দেখতে পেলাম। তারই আড়ালে একটা টাইপ-রাইটার ব্যস্তভাবে খট্‌খট্ শব্দ করে চলেছে। মাপা স্বরে কে যেন বলে যাচ্ছেঃ

.........এবার কমা, উত্তর-পূর্বের উপরোক্ত চড়াই থেকে, কমা, তারা এসে পড়ল রেলের সড়কে, কমা, সেখানে তারা.........

রক্ষীরা গুপ্তদরজায় ঘা মারল, খুলে গেল দরজা, ভিতরে ক্ষীণ আলো। রক্ষীরা এবার একটা বাসের পাদানিতে উঠে পড়ল—ছোট ছোট পাইনের চারা দিয়ে চারদিক ঢাকা। সে ফিস ফিস করে আমাদের আসার সংবাদ দিল।

এক মিনিট, স্বর বলল, তারপর আবার শুরু হোল.........
সেখানে এসে তারা তিনটি ট্যাঙ্ক আর ফিল্ডগানের আচ্ছাদনী খুলে ফেলল, কমা, তারই আড়ালে শত্রুর বাঁদিকের সৈন্যেরা পিছু হঠ্‌তে লাগল। তারপর স্বর থেমে আবার বলল, ভিতরে এস!

আমরা বাসের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটা আলো জ্বলছে ঘরে। ক্ষীণ তার দীপ্তি। একটা ছোট্ট টেবিলে একটি মেয়ে বসে, তার মাথাটা টাইপরাইটারের ঢাকনার উপর হেলে পড়েছে, এই বিরতির সুযোগে সে কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি আসুন, দোরটা বন্ধ করে দেবেন, জানেনতো ওরা রাত-দিনই আকাশে ঘোরাফেরা করছে। অধ্যক্ষ বললেন, তার পরনে ইস্পাত রঙের গ্যাবার্ডাইনের জামা, দু'টি সামরিক সম্মানসূচক চিহ্ন সেখানে—একটি লাল তারা আর একটি লেনিন-পদক। কাঁধে ট্যাঙ্ক আঁকা।

তিনি তার মাথায় হাত বুলোলেন। গোল মাথা, কামানো, কেমন

নীলাভ আলো বেরুচ্ছে! তিনি ভ্রূকুটি করলেন; যার উপরে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত তিনিই এমনি কঠোর ভ্রূভঙ্গিতে অভ্যস্ত। হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার পরিচয় পত্রের জন্য। কাগজ হাতে নিয়ে বাতির আলোর ধারে মোটা ফ্রেমের চশমা পরে নিলেন, এবার তার রোদে-পোড়া তামাটে মুখখানা থেকে কঠোরতা উবে গেছে, এসেছে এক কোমলতা। কেমন যেন পিতৃত্বের ভাব মাখানো। দু'বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি পড়ে দেখলেন। তারপর খুব সাবধানে চার ভাঁজ করে আমাকে ফেরৎ দিলেন কাগজখানা।

আমি জানতাম, তিনি বললেন, জেনারেল ষ্টাফ থেকে খবর পেয়েছিলাম। তারপর ভ্রমণ কেমন হোল? ভালোই, তাই না? পথে বোমা পড়েনি তো? আমাদের দু'জন লোক আর একটা মেশিন-গান বিকল হয়ে গেছে। শত্রু এবার জোর প্রতিরোধ শুরু করেছে। এই কমরেড কি আপনার সঙ্গে এসেছেন?

নিনা পেত্রভ্না ব্যাগ থেকে পাশ বার করে তার হাতে দিলেন। কর্ণেল এখানাও ভাল করে পড়ে দেখে চার ভাঁজ করে ফেরৎ দিয়ে বললেন: আপনি এখানে কি করে এলেন? পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন? হাঁ, এমনি ভুল হয় বটে।

নিনা তার কাহিনী বললেন সংক্ষেপে। কর্ণেল একটা হলদে চামড়ার থলে থেকে টেলিফোনটা বার করে মাউথপিসে কথা বলতে শুরু করলেন!

টিউবরোজ—আমাকে টিউবরোজের সংযোগ দাও? টিউবরোজ? সপ্তম কথা বলছি। এনিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে? বেশ, তাহলে আমাকে যোগাযোগ করে দাও।

তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর মস্কোর হালচাল কি? আর্ট থিয়েটার কি ফিরে এসেছে? উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি

আবার ফোনে কথা বলতে শুরু করলেন। এনিসে? সপ্তম কথা কইছি। কে কথা কইছে? হ্যাল্লো—এরই ভিতরে চলতে শুরু করেছে? অভিনন্দন জানাচ্ছি। শোন; ব্যাপারটা······কারো আসবার কথা আছে? আছে? তাহলে গাড়ি পাঠাও, তিনি এখানে আমার বাস-অফিসে আছেন। মাইনের বিস্ফোরণ শুনছেন বসে বসে, যা'ই বল তাঁর পক্ষে শব্দটা খুব মিষ্টি নয়। নিনা পেত্রভনা—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তার নাম। উঃ তোমরা যা করলে! কি করে হোল, জানিনা। তোমরা বলতে পারো, আচ্ছা ওঁকে বলছি। এখন শান্ত তো অবস্থা? হ্যাঁ এখানেও। তবে কাল কি হবে কে জানে। বিদায়!

তিনি রিসিভারটা ঝুলিয়ে রাখলেন।

নিনা পেত্রভ্‌না, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ওরা কাল ভোরেই আপনাকে নিতে আসবে, কিন্তু আজকে যে আপনার কি ব্যবস্থা করব ভেবে পাচ্ছিনা। আমাদের জিনিসপত্র সব চলে গেছে। আমরাও চলার মুখে, এমন কি একটা তাঁবু পর্যন্ত নেই। আমরা বাইরে শুয়ে কাটাচ্ছি, এই অফিসে অবিশ্যি আপনার জায়গা হতে পারে, কিন্তু এখানে ঘুম হবে না। প্রথমে টেলিফোনের ঝনঝনানি তো আছেই, তার উপরে আছে আমার টাইপরাইটার।

না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না; নিনা পেত্রভ্‌না বললেন, আপনাকে অনেক—অনেক ধন্যবাদ। আমি বাইরেই শোব। রাতটা তো বেশ গরম।

আমি আপনাকে আমার জোব্বাটা বরং দিচ্ছি। বেশ নরম আছে।

"···কমরেড লেখক, আপনি বাইরে কোথাও গিয়ে শুয়ে পড়ুন। একটু ঘুমিয়ে নিন। জেনারেল এখনো এসে পৌছননি। তিনি সেনাবাহিনী পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। এখন ট্যাঙ্কের দরকারই সব চাইতে বেশি!

জেনারেল এলেই আপনাকে জাগাব। শুভরাত্রি! কাল আপনাদের চমকে দেবায় মতো বহু খবরই দিতে পারব।

কিছু আন্দাজ করছেন?

কি করে বলি। একটু একটু করে আমরা এগুচ্ছি। শত্রুও আত্ম-সমর্পণ করতে রাজি নয়, তারা বাধা দিচ্ছে। এখন ওরা আছে একটা ছোট্ট নদীর পারে। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে। আমরা তো তাদের সেখানে বহাল তবিয়তে থাকতে দিতে রাজি হতে পারি না। কালই আমরা ওখান থেকে ওদের চলে যেতে বলব। যাকগে, আজকের মতো বিদায়! শুভরাত্রি আর শুভস্বপ্নে বিভোর হয়ে যেন রাত কাটে আপনাদের।

কর্ণেল টাইপিষ্টকে জাগালেন। মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল। এখনো তার চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে, চুল তার এলোমেলো। টাইপরাইটারের চাবির উপর হাত রাখল। আমরা বেরিয়ে আসবার সময় শুনলাম কর্ণেল বলছেন:

লাল ফৌজের ঘাঁটি থেকে, দাড়ি। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শত্রুর বোমারু বিমানগুলো খুব বোমা ফেলছে, কমা…

চাঁদ এখনো উজ্জ্বল। আকাশের পটভূমিকায় পাহাড়গুলো কালো আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ছদ্ম আবরণ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে শান্ত্রীকে। গুহামুখে ঘাসের উপর জোব্বাটা বিছিয়ে নিলাম। নিনা পেত্রভ্‌না জোব্বার একধারে ব্যাগটা মাথায় দিয়ে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন। চুপ করে আছেন তিনি। আমি আর একপাশে হ্যাভার-স্যাক মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম, কান আমার টুপি দিয়ে ঢেকে রেখেছি। আমাদের চারদিকে নিস্তব্ধতা—আক্রমণের আগের রাতে শত্রু যখন দু'মাইলের কম দূরে তখন যতটুকু নিস্তব্ধতা সম্ভব। কামানের শব্দ

প্রায় শোনা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে দু'একটা বন্দুকের শব্দ নিস্তব্ধতায় আছড়ে পড়ছে। মাথার খুব উঁচুতে গুলী চলে যাচ্ছে। আমরা টেরও পাচ্ছিনা। মাঝে মাঝে জার্মানদের দু-একটা মাইন এসে পড়েছে পাহাড়ের ওপর, ফেটে পড়েছে—শব্দে সে ভীষণতা নেই, চারদিকে পোড়া সেলুলয়েডের গন্ধ। কিন্তু এ তো অন্ধকারে ঢিল মারবার মতোই, এতে কেউ ভয় পাচ্ছেনা।

দুরে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশে গোলাপী তারারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা ট্যাঙ্ক দূরে শব্দ করে উঠলো। কিন্তু এই শব্দের আড়ালে ঝরে পড়ছে এক রহস্যময় নিস্তব্ধতা। তাই ঘুমোনো এখানে অসম্ভব। কেমন অস্বস্তি লাগছিল, পর পর সিগারেট টানতে শুরু করলাম। শুকনো তামাক কাগজে পাকিয়ে তৈরি করছি আর টানছি। দেশলাইয়ের আলো যেন বহ্নি-উৎসব মনে হচ্ছে, সারা গিরিপথ বুঝি আলো করে দেবে। যখনই দেশলাই জ্বালছি, উদ্ধত কর্কশ স্বরে হুকুম আসছে :

আলো নেবাও। ওরা সব সময়ে আকাশে উড়ছে।

নিনা পেত্রভ্না ঠিক আরাম করে শুতে পারছেন না। তিনি শেষে উঠেই বসলেন, হাঁটু জড়ো করে তার ওপর মাথা রেখে বসে আছেন।

ঘুমোচ্ছেন না কেন? জিজ্ঞেস করলাম, ঘুমিয়ে পড়ুন।

তিনি চাঁদের আলোয় তার হাতের বড় ঘড়িটা দেখলেন।

বারোটা বাইশ। দীর্ঘ এক হাই তুললেন, ঘুমোতে পারছি না।

ঢালু যায়গায় শুতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়।

না। কোথাও ঘুমুতে পারতাম না। আমার যে কি হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন না। এখন জুলাই, ১৯৪৩ সাল, আমার স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন বেয়াল্লিশ সালে। গুণে দেখুন, ষোলো মাস হোল। আমি এই ষোলমাস রোজ ভেবেছি, কবে তার সমাধি দেখতে পাব, অবশেষে…হয়তো

কালও দেখতে পেতে পারি……আপনি যদি বুঝতেন, কি অসহ্য যন্ত্রণা অমি সহ্য করেছি। কি যে করব নিজেকে নিয়ে ভেবে পাচ্ছিনা।

'বেশ সুখেই তো ছিলাম' নিনা পেত্রভ্‌না হঠাৎ সহজভাবে বলে উঠলেন। বিশ্বাস তার স্বরে ঝরে পড়ছে। এমনি এক অদ্ভুত অবস্থায়, যখন আত্মা রাতের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছে আলোর সন্ধানে, তখন কাউকে পেলে বুঝি এমনি স্বরই বেরোয়। ভারি আমুদে লোক, একটুও গর্ব ছিলনা। ভারি সহজ সরল ছিল তার ব্যবহার। 'ভাগ্যবতী আমি, তাকে ভাল বেসেছিলাম, তার ভালোবাসাও পেয়েছিলাম। কিন্তু বেশিদিন তো আমার সে সুখ রইলনা।' তিনি তাকিয়ে রইলেন মাটির দিকে, দৃষ্টি নিচের দিকে। এক দীর্ঘ কহিনীই বুঝি তিনি শুরু করবেন।

'আমার সব চাইতে প্রিয় বন্ধু আর সঙ্গী ছিল সে। সীমান্ত থেকে নিয়মিত চিঠি লিখত। সেই চিঠিগুলোই ছিল আমার সব-কিছু। তারই জন্য আমি বেঁচে ছিলাম। প্রতি চিঠিতে আমাকে সাহস জোগাত, সে বেঁচে আছে ভেবে নিশ্চিত হতাম। মনে হতো, তার চিঠি না পেলে আমি বাঁচবনা।

'তারপর একদিন আর চিঠি এল না। আমি জানি, যুদ্ধ কত সর্বনাশা। বিদায়ের সময় আমি তো নিজেকে চরম সংবাদের জন্যই তৈরি রেখেছিলাম। কিন্তু যখন সেই সর্বনাশ এল, বিশ্বাস করতে পারলাম না—খুবই অসম্ভব, সাংঘাতিক আর অস্বাভাবিক বলে মনে হোল। এ চিন্তাও যেন ভয়ানক—সে মরে গেছে, এ-পৃথিবীতে সে আর নেই। চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে সে চলে গেছে। যেন জমে গেলাম খবর পেয়ে, খবরটা পড়লাম বার বার। অবশ হয়ে এল শরীর, একেবারে অবশ। কিন্তু প্রথম ধাক্কা যখন সামলে উঠলাম, অনুভব করলাম এক কর্মপ্রেরণা। দেরি না করে ছুটে গেলাম, তার করলাম,

চিঠি লিখলাম, সামরিক দপ্তরে ঘুরে ঘুরে খবর দিলাম·········তখনো আশা, বোধ হয় ওকে বাঁচাতে পারব, বোধহয় ফিরে পাব—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আর কিছুতো করবার উপায় নেই। এক তিক্ত উপলব্ধি এল ঘনিয়ে।'

[তিন]

'তাড়াতাড়ি পরে নিলাম আমার জুতো, ওভার কোট নিলাম টেনে, মাথায় রুমাল বাঁধলাম, আমার ব্যাগ টাকাকড়ি আর পেন্সিল খুঁজে বেড়ালাম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে! তখন কাউকে আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা জানাবার ইচ্ছে ছিলনা। কেন জানিনা, তখন বার বার বললাম, না না কাউকে জানতে দেওয়া হবেনা। এ দুর্ভাগ্যতো আমার একার, একাই সব করব। কিন্তু কি করব, কিছুইতো জানিনা।

দোরে চাবি বন্ধ করলাম, বারান্দায় জলের পিপেটার নিচে রাখলাম চাবিটা লুকিয়ে। আমার বাড়িউলী তখন রান্নাঘরে কতগুলো বাসন নাড়াচাড়া করছিল। ভয় হোল ও হয়তো এখুনি আমাকে ডাকবে। ভগবানকে ধন্যবাদ, ও আমাকে ডাকল না।

উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। মার্চ মাসের শেষ; কিন্তু এখনো জানুয়ারীর

বরফ পড়ার জের থামেনি। ভুলে গেলাম কেন শহরে এসেছি। পথে না বেরিয়ে বাড়ির পেছনে চলে গেলাম। উঠোন পেরিয়ে ভল্‌গার দিকে চললাম। শীতের দিনের জন্য উঠোনে একটা নৌকা পড়ে আছে। বরফে ঢেকে আছে নৌকাখানা। শক্ত বরফের উপর দিয়ে রান্নাঘরের পাশের ফালি বাগানটুকু পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম ভল্‌গার পারে।

ভলগাকে জানিও আমার প্রীতি সম্ভাষণ—জানুয়ারীতে মস্কোতে যখন বিদায় নিই তখন আন্দ্রেই বলেছিল। সেই কথাই মনে পড়ল। সেই তার শেষ কথা। বিদায় নেবার পর দূর থেকে সে বলেছিল। আমাদের শেষ চুম্বন তখন শেষ হয়ে গেছে। সে নেমে যাচ্ছে মস্কোভা হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে। ফার-দেওয়া জামা তার পরণে, হাতে ছোট্ট একটা সুটকেশ। আমি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। চওড়া সিঁড়ির সার নেমে গেছে, তার পেছনটা দেখা যাচ্ছে। কি চমৎকার তাকে দেখাচ্ছিল, ফার-কোট আর বুট পরে!

হঠাৎ থেমে একবার উপর দিকে তাকাল, তার নীল চোখ ঝলসে উঠল, সে আমাকে ডেকে বলল—ভলগাকে জানিও আমার প্রীতি-সম্ভাষণ! তার স্বর গম্ভীর, ভলগার উপকূলের অধিবাসীর মতোই সে উচ্চারণ করল, 'ও' বিস্তার করে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানাব। আমি চিৎকার করে বললাম। কিন্তু তার মতো আনন্দ ঝরে পড়ল না আমার স্বরে।

আমাদের দুজনের স্বর মিশে গেল শেষ বারের মতো, প্রতিধ্বনি উঠল চারদিকে।

নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। আমাদের ঘর তো আর নয়, দরজা খোলা। দুজন পরিচারিকা পরিষ্কার করছে ঘর, সব গুছিয়ে রাখছে। স্নানের ঘরটা এখনো তেমনি আছে। সেখানে এখনো সাবান আর

অ-দ্য-কোলোঁর গন্ধ। গোল্ডেন ফ্লিস পাইপের তামাকের গন্ধ ভরে আছে। কিছুক্ষণ আগে আন্দ্রে দাড়ি কামাচ্ছিল, তার দাঁতের ফাঁকে তখন ছিল জলন্ত পাইপ, এই তার অভ্যেস।

সেই ঘরখানা আমার আর আন্দ্রের তিনদিনের বাঁধা সুখের ঘর, তিনদিন আমরা বিচ্ছেদের কথা ভুলে সেখানে ছিলাম। দৈবাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মস্কোএ, কিছু ঠিক ছিলনা। কুইবিশেভ থেকে কারমেট-এর প্রধান আফিস মস্কৌতে আমাকে পাঠান হয়েছিল আমাদের কারখানা সরিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করবার জন্য। ও এসেছিল সীমান্ত থেকে, কালিনিনের কাছ থেকে সামরিক সম্মান ক্ষুদ্র স্বর্ণ-তারকা গ্রহণ করতে। ভাগ্য চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ নিয়ে আসবার আগে আমাদের ছিল তিনটি সম্পূর্ণ দিন আর অবিস্মরণীয় সুখ। তিনদিন চলে গেল, চলে গেল আন্দ্রে। আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। আমার কাজ তখন শেষ হয়ে গেছে।

শেষ ক'ঘণ্টা কাটালাম ঘরে। কি একা তখন আমি! বিষণ্ণতা চেপে বসেছে মনে। সেদিন সেই ঘরে যে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছিলাম তার সঙ্গে ভলগার পারে বরফের স্তূপের ভিতরের সেই নিঃসঙ্গতার কি তুলনা চলে?

বরফ-ঢাকা ভলগার পরপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, শেষ সূর্যের সে কী আলো! বিশ্বাস হয় না। পূবাল বাতাস যেন তার লাল হলদে আর সবুজ শিখা আরো বাড়িয়ে দিল। দিক-চক্র রঙে রাঙা। আমার হাত যেন কেমন অবশ হয়ে এল। আঙুল আর বেঁকতে চায় না। আমি হাত দু'খানা বুকের উপর চেপে ধরলাম জোরে। পশ্চিমের দিকে তাকালাম, মনে হোল যুদ্ধ ওখানেই জ্বলে উঠেছে। সারি সারি ট্যাঙ্কের নীল ছায়া যেন দেখলাম দিগন্তে। কামানে কামানে

লেগেছে সংঘর্ষ, তারই আলো এসে পড়েছে ঠিকরে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে খড়ের চালাগুলোর উপর, বাতা ভেঙে পড়েছে। এক উন্মত্ত দুর্বহ নিস্তব্ধতার ভিতরে সবগুলো ব্যাপার ঘটে গেল।

আবার বাড়ির ভিতরে ফিরে এলাম। আলো না জেলে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কোট আর জুতোও খুললাম না। দেওয়ালের দিকে আমার মুখ ফেরানো। হঠাৎ কেঁপে উঠলাম। পা দু'টো জড়ো করে হাত দু'খানা বুক চেপে ধরে বার বার বললাম, কি সর্বনাশ হোল আমার, কি সর্বনাশ হোল আমার, কি সর্বনাশ। হঠাৎ ভয় পেলাম, কেউ যদি শুনতে পায়। আস্তে ফিসফিসিয়ে বললাম: কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! কিন্তু আমার এই সাবধানতা চলে গেল, আবার চিৎকার করে উঠলাম। কেউ শোনেনি।

আমি একা। আমার দুঃখ নিয়ে আমি একা পড়ে রইলাম। এখনো অভ্যস্ত হইনি, পুরোপুরি বুঝতে পারিনি কি ঘটছে। মুহূর্তগুলো ভীষণ হয়ে দেখা দিল। কেননা, তখনও আমি নিষ্ঠুর বাস্তবকে অসম্ভব, অবাস্তব বলে ভাবছি।

কেন এমন হোল, ভাবছিলাম। আন্দ্রে তো চমৎকার লোক ছিল, ওর মতো লোক তো দেখাই যায়না। আমরা পরস্পরকে খুব ভালোও বাসতাম, আমরা ছিলাম সুখী। আমাদের সন্তান হতে পারত, এক সুখী পরিবার আমরা গড়ে তুলতে পারতাম। জীবন তো ছিল আমাদের সুমুখে বিছিয়ে। কিন্তু তাকে নিহত হতে হোল। আর তাকে দেখবনা, চুমু খাবনা, তার স্বর শুনবনা। সে মৃত। সে চলে গেছে। সব-কিছু ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু সে তো এখানে নেই। সে পৃথিবীতে নেই, আর একটা ভয়ানক কথা মনে পড়ল, প্রতিদিনের সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতি যাবে ক্ষীণ হয়ে। সে তখন আরো দূরে সরে যাবে।

সেই দিনই আবিষ্কার করলাম, আন্দ্রে আর নেই, কিন্তু সে তার দু'সপ্তাহ আগে চলে গেছে। দু'সপ্তাহ পরে এসেছে খবর, কিন্তু সে তো তার বহু আগে চলে গেছে। জানুয়ারী মাসে মস্কোভা হোটেলে বিদায়ের মুহূর্তে তাকে শেষবার দেখেছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে সে নামছিল। সেইদিন থেকে সে তো গেছে আমার কাছে হারিয়ে। তারপর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে সে দূরে সরে গেছে। মানুষের স্মৃতি তো সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না! এইতো তার স্বর। কি চমৎকার তার স্বর! আজ স্বীকার করতে ব্যথা বাজছে, তবু সে স্বর তো স্পষ্ট করে মনে করতে পারিনা। কল্পনা করতে পারি, কিন্তু সে স্বর তো স্পষ্ট কানে বাজে না!

স্মৃতির কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে কাটালাম আমার বিধবাজীবনের প্রথম রাত।

তার পরদিন সকাল সাতটা। সাধারণত আমি আটটায় উঠি। কিন্তু সেদিন উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। একা ঘরে থাকবার শক্তি নেই, নেই সাহস। বারান্দায় গিয়ে বরফ-গলা জলে স্নান করলাম। বাড়িউলী রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে বলল:

কে নিনা পেত্রভ্না নাকি?

হ্যাঁ।

আমি ভাবছিলাম, কাল বোধ হয় তুমি ফেরনি।

আমাকে মাঝে মাঝে রাতে কারখানায় কাটাতে হয়। কিন্তু আমার বাড়িউলী অন্যরকম ভেবেছে, ভেবেছে আমি কোথাও ফুর্তি করতে গিছলাম।

হাঁ, আমি রাতে ঘরেই ছিলাম, বললাম। ওকে আমার একটুও পছন্দ-নয়। ঝগড়াটে, স্বভাবটাও খারাপ। আমাকে ঘর ভাড়া দিয়ে যেন কৃতার্থ করেছে এমনি তার ভাবখানা। প্রথমে তো কি করে থাকতে হয় সে আমাকে শেখাতে এসেছিল, আমার কাছ থেকে ভাড়া খেয়ে এখন

আমাকে ছোটখাটো ব্যাপারে জ্বালায়। তাছাড়া, যখন বাড়ি থাকিনা, আমার চিনি চুরি করে নিয়ে যায়, জিনিসপত্র হাতড়ায়, আমার চিঠি পড়ে। অবশ্য এসব তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এসব দেখেও দেখি না। তবে মাঝে মাঝে ভীষণ চটে যাই। আমি তখন একটা ঘরের চেষ্টা করছিলাম।

খবর-আসা চিঠিখানা ব্যাগে রাখলাম, যাতে যখন বাড়ি থাকবনা তখন আমার বাড়িউলী না পড়তে পারে। ঘরে চাবি দিলাম, চাবিটা রাখলাম জলের পিপের নিচে।

কি, নিনা, এত তাড়াতাড়ি যে? বাড়িউলী বলল—খুব ব্যস্ত নাকি?

হ্যাঁ, অনেক কাজ আছে। উত্তর দিলাম।

সরকারী খবর দেখেছ?

না, দেখিনি।

আমিও দেখিনি।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে। লোকে বলছে সেবাস্তপুলের কাছাকাছি নাকি খবর ভাল নয়!

জানিনা।

হ্যাঁ···ব্যাপারটা···সুখ···

এবার আরো বিরক্ত হলাম। আমার জীবনের স্মরণীয় স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্রাইমিয়া আর সেবাস্তপুলের নাম। বুক যেন খান-খান হয়ে যাবে মনে হোল।

কারখানায় ঢোকবার মুখে ফটকের শান্ত্রী আমাকে থামিয়ে পাশ চাইল। সে আমার বহুদিনের চেনা, বুড়ো, পঙ্গু সাজি সার্জেভিচ, আমাকে সে ভাল করেই চেনে, কখনো পাশ চায়নি। অবাক হয়ে থেমে গেলাম।

আমাকে চিনতে পারছনা?

না পারছি না। আমার কি হয়েছে বুঝতে পারছিনা। একটা পুরোনো প্রবাদ আছে, তোমার চেনা লোক যদি চিনতে না পারে, জানবে

একদিন বড়লোক তুমি হবেই। আচ্ছা, এবার আপনি যান।

কারখানায় ঢুকে আমার ছোট আরশিখানায় মুখ দেখবার জন্য একটু দাঁড়ালাম। দুঘণ্টা আগে দ্রসকিতে চড়ে ক্রাইমিয়ার জ্বলন্ত রোদে সেবাস্তপুল থেকে জর্জিয়েভ্স্কী মঠে যে যুবতীটি যাচ্ছিল, তার মুখ থেকে এ-মুখখানা একেবারে আলাদা। আমার মুখখানা শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে, চোখে রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন। একি আমার গাল, আমার ঠোঁট, আমার কপাল? না, না, আমার নয়। এ আর কোনো লোকের, তাকে এখনো কেউ চেনে না। অদ্ভুত তার চোখ। সে সোভিয়েট-বীর ক্রুস্তালেভ্-এর বিধবা। বিধবা প্রথমে নিজেকে ঐ নাম ধরে ডাকতেও ভয় হয়, ব্যথায় দুলে ওঠে বুক!

-*—

[চার]

নতুন জীবন শুরু। কিছুই নতুন নেই, আমি বিধবা এইটুকুই শুধু নতুন। তখন থেকে আমার জীবনে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। একটা সরল, অনাড়ম্বর বর্তমান জীবন, আর একটা জীবন স্মৃতির। দুটো জীবনই পাশাপাশি চলছে। একটার সঙ্গে আর একটা মিশে যায়নি, তবে একটা আর একটার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

তখন থেকে প্রায় প্রতিদিনই কারখানায় শুতে লাগলাম। একা ঘরে থাকা তখন অসম্ভব। বাড়িউলীর বাক্স পেঁটরায় আমার ঘরখানা বোঝাই, তাছাড়া সরু-সরু নড়বড়ে তাক, তাতে নানা বিদ্ঘুটে জিনিসপত্র। ব্রোঞ্জের কুকুর, সমুদ্রের ঝিনুক, স্ফটিকের একটা ডিম, তার ভিতরে ঘরের প্রতিটা জিনিসের ছায়া পড়ে। না, তেমনি ঘরে শুয়ে রাত কাটানো এখন অসম্ভব।

যুদ্ধের আগের একটা ব্যারাক-বাড়ির লম্বা আস্তাবলে আমাদের কারখানা। কারখানার চারপাশে নানা ধাতুর পাত বরফের উপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে। কি পরিষ্কার মনে পড়ছে আমার··বিধবাজীবনের প্রথম দিনের ছবি। যখন উঠোন পেরলাম, আমার সে আগেকার ব্যস্ততা ছিলনা। অফিসে না ঢুকে যেখানে বল-বেয়ারিং-এর কাজ হচ্ছে সেখানে সোজা চলে গেলাম। এই বিভাগটা কারখানায় কিছুদিন হোলো খোলা হয়েছে। দরজা খুলে ফেললাম। মেশিনের শব্দ আমাকে ঘিরে আচ্ছন্ন করে দিল। কালকের মতোই সব, কিছুই বদলায়নি। ভোরের নীলাভ আঁধারে এখনো জলছে সহস্র শক্তির ঢাকনাহীন বিজলী আলো। তেমনি আরকের ধারা বয়ে যাচ্ছে নিচে। মুক্তোর মতো আলোয় ঝলসাচ্ছে। তেমনি শান-দেওয়ার যন্ত্র থেকে ঠিকরে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ, তেমনি বসে আছে শিক্ষানবিস অল্প বয়েসী মেয়েটি, নাম তার মুশিয়া। কালো জোব্বা তার পরনে, আস্তিন গুটোনো; তার মোজাপরা খুদে পা দুটো দেখা যাচ্ছে, পায়ে স্পোর্ট শু। তেমনি সামরিক পোষ্টার আর জীগীর লেখা বিজ্ঞাপনগুলো উদ্ধতভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

সবই কালকের মতো। শুধু আমিই নতুন, আমার এসেছে নতুন দুঃখ, কিন্তু কেউতো জানেনা।

আমি মুশিয়ার কাছে গিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানালাম। মেয়েটা মাথা নাড়লো, চোখ তখনো তার বেঞ্চের দিকে, সে গুনে গুনে ইস্পাতের বেয়ারিংগুলো ফেলছে—কারখানায় এইটিই নতুন জিনিস। অন্য হাতে সে আর একটা টুকরি তুলে নিল। শেষ বেয়ারিংটা টুকরিতে ফেলে দিয়ে আবার এক মুঠো নতুন বল তুলে নিল।

চমৎকার! আমি তার ক্ষিপ্রতা দেখে আশ্চর্য হলাম।

খুব চতুর তো তুমি মুশিয়া! কাজ করবার নতুন উপায় বার করেছ

দেখছি।

মুশিয়া মাথা নেড়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করল, উত্তর সে তখনই দিলনা।

পরে বলল, আজই এটা বার করলাম। ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ—তার ঠোঁট নড়ছে, সে গুনে চলল।

আমি তখনই বুঝতে পারলাম। সে দশটা করে একসঙ্গে গুনছে, ভুল হয় পাছে, তাই সে খুব সাবধান। আমি আস্তিন দিয়ে তার নাকের কালি মুছে দিলাম। সে একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর মুখ উঁচু করল, আমি বুঝতে পারলাম। তার ভাবভঙ্গিতে গর্ব। সে যেন বলছে : দেখ, কত চতুর আমি! সত্যিই মুশিয়া ভারি চমৎকার মেয়ে!

একদিন আমাদের কারখানায় এলেন বিদেশী খবরের কাগজের ক'জন সংবাদদাতা। তাদের গায়ে হালকা অথচ গরম ওভারকোট, ফারের দস্তানা, পায়ে পুরু জুতো। একজন মেয়ে দোভাষা আর কারখানার কর্মকর্তা ছিলেন ওদের সঙ্গে। তাঁরা যন্ত্রপাতি ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

তারপর একসময়ে এলেন মুশিয়ার পাশে। খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তার দ্রুত কাজ করার কৌশল। তাদের মুখচোখ রাশিয়ার শীতে লাল হয়ে গেছে। তারা বেশ ব্যগ্র হয়েই দেখলেন, এমনকি হাতের জলন্ত সিগারেট টানতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন। এই সুশ্রী কৃশ মেয়েটি একটা বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে, পরনে তার কালো জোব্বা—এই দেখেই বোধ হয় তারা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাঁরা ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। কর্মকর্তা হেসে বললেন :

কিগো মুশিয়া, কাজ চলছে কেমন?—সে তাকাল তাঁর দিকে। চোখে তার ভ্রূকুটি। ঠোঁট তখনো তার নিঃশব্দে নড়ছে, দশটা করে বেয়ারিং গুনছে, সে বলল, আমি ব্যস্ত আছি।

তার বেঞ্চের দিকে সে তাকাল, হাত থেকে রাখল একমুঠো বল। কিন্তু এই যে কথাটা বলল, এর ভিতরে বিন্দুমাত্র অভদ্রতা ছিলনা, কর্তার সুমুখে গর্ব করবারও তার ইচ্ছে ছিলনা। যে তার কাজে বাধা দিয়ে তাকে বিরক্ত করবে তাকেই সে এমনিভাবে বলত। সে যে কাজ করছে কর্মকর্তার চাইতে অনেক জরুরী, দোভাষী মেয়েটি আর এই মার্কিন সাংবাদিকদের চাইতেও ঢের জরুরী—এমন-কি পৃথিবীর সব-কিছুর চাইতে জরুরী।

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবেনা, কারখানার কর্মকর্তা শ্রমিকের চোখে কত বড়।

কর্মকর্তা হাত ছড়িয়ে দিয়ে হতাশার ভঙ্গি করলেন। তিনি বলতে চাইলেন: কোন উপায় নেই, মেয়ে দোভাষীটি কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাল। বিদেশীরা হো হো করে হেসে উঠে তাকে প্রশংসাই করলেন। একজন শ্রেষ্ঠ নর্তকীকে যেমন করে সম্মান জানায়, তেমনি করে আমার খুদে মুশিয়াকে ওঁরা অভিবাদন করলেন। কিন্তু মুশিয়ার ভ্রূক্ষেপই নেই। তাঁরা যে এখানে আছেন, এই কথাই সে ভুলে গেছে,—এমন-কি নাক চুলকোবার সময় তার নেই।

আপনাকে বলি, মুশিয়া আর একটি ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছিল। সেও শিক্ষানবিস। স্পেন দেশের ছেলে, নাম জোস, সবাই জোসিয়া বলে ডাকে। জোসিয়ার হাত দু'খানা সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে ইচ্ছে করে। কত ছোকরা তো কারখানায় কাজ করে ওর বিভাগে কিন্তু ওর সঙ্গে কাজে কেউ এঁটে উঠতে পারেনা। যখন মুশিয়া ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ শুরু করল, সবাই হাসল, এক জীবনপণ যুদ্ধ চলল তাদের। আমার মনে হয়, মুশিয়ার নিজের সম্বন্ধে ধারণা একটু বেশিই-ছিল। দিন গেল, কিন্তু জোসিয়ার সম্মান সে কখনো একদিনের জন্যও

কেড়ে নিতে পারেনি।

মাস শেষ হয়ে এল। সবাই তখন মুশিয়াকে ঠাট্টা করতে শুরু করেছে। হতাশ হয়ে গেছে সে, রোগা হয়ে যাচ্ছে। জোসিয়া প্রকৃত শিল্পীর মতো সহজ সরল গতিতে চলেছে কাজ ক'রে। এবার সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কখনো-বা কাজ ছেড়ে সে পাশের লোকের সঙ্গে কথা কইত, সিগারেট ফুঁকত। কখনো-বা ইচ্ছা করে কম কাজ করত। তারপর হঠাৎ সিগারেট ফেলে, জুতোর গোড়ালি দিয়ে চেপটে দিয়ে সে গিয়ে বসত কাজ করতে। দেড়ঘণ্টায় এতক্ষণের ক্ষতি পুরণ করে দিত। এমন-কি বাড়তি এত কাজ করত যে আবার কিছুক্ষণ কথা কইবার, সিগারেট ফোঁকবার সময় পেত। আর এই সময়টা সে একবারও মুশিয়ার দিকে তাকাত না। মুশিয়ার অস্তিত্বই যেন তার কাছে নেই।

আমি জোসিয়ার কাছে গেলাম। কারখানার ভিতরে বেশ ঠাণ্ডা। জোসিয়া কোট খুলে রেখে কাজ করছে। রীতিমতো কাজের লোক সে। তার কালো সাটীনের সার্টের গলা খোলা, আস্তীন কনুই অবধি গোটানো। হাত দুটোর রং ঈষৎ হলদে, গলায় ডোরাকাটা রুমাল বাঁধা, এছাড়া তার ভিতরে স্পেনীয় কিছু নেই। কিছুদিন আগে সে তার চাপদাড়ি কামিয়ে ফেলেছে, এখন সে যে-কোন ছোকরা রুষ মিস্ত্রীর মতোই।

আমরা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানালাম।

কি হে জোসিয়া, বললাম।—আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনাকে। জোসিয়া কারো কাছে কথাটা শুনেছিল, সে তারই ভঙ্গি অনুকরণ করে বলল :

এখনো সিগারেট ফুঁকছ ?

হাঁ, নিনা পেত্রভ্না, একটা খাবেন নাকি ?

তোমাকেই সিগারেট করে ফুঁকব, হাসি চেপে কঠোর স্বরে বললাম:

আপনি আমার উপর চটছেন কেন, নিনা পেত্রভ্‌না? আপনাকে তো আমি কখনো হতাশ করিনি! দেখুন, কাজ সব ঠিক আছে।

সত্যিই অভিযোগ করবার কিছু নেই। সব-কিছু যেন এই খুদে মানুষটির আয়ত্তে, তার বেঞ্চটাও বেশ পরিষ্কার। খানিকটা জায়গা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে। একটা পেরেকে ঝুলছে ঝাটাটা। বেঞ্চির ওপর খুদে লাল ঝাণ্ডাটি, ইনষ্টুমেণ্ট বক্সের উপরে হাতে-গড়া ফ্রেমে দিনের কাজের তালিকা।

একটু কঠোরতা দেখালে ক্ষতি হবেনা জেনে ওকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, আরক নষ্ট হচ্ছে। সে কলটা একটু ঘুরিয়ে দিলে। আমি ওর কটা বেয়ারিং বাক্স থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। ঠিকই আছে। যখন পরীক্ষা করে ফিরে এলাম, দেখি জোসিয়া তখনো সিগারেট ফুঁকছে।

জোসিয়া সাবধান, বললাম, এখনো তুমি হেরে যেতে পার। সিগারেট ফুঁকছ, দেখে যাও মুশিয়া কি করেছে।

কি করেছে ও? জোসিয়া উদাসীন স্বরে বলল। সে সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে পিষে দিলে, তারপর ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিল।

যাও গিয়ে দেখে এস।

হুঁ: জোসিয়া বলল।

সে তার বেঞ্চে বসে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ শুরু করল।

দেখ-না-দেখ তোমার ইচ্ছে, বললাম, হাঁ, তার ক্ষিপ্রতা আমাকে মেনে নিতে হোল।

[পাঁচ]

আমি সারা বিভাগটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দাঁড়ালাম।

যারা অপরিচিত তাদের কাছে এই বেঞ্চগুলো দেখে একঘেয়ে মনে হবে। সবগুলো বেঞ্চই ধূসর আর লাল ডোরা কাটা, নম্বর লাগানো। আমি প্রতিটির পরিচয় জানি বলে আমার কাছে কিন্তু একঘেয়ে লাগেনা।

মস্কোর বিরাট কারখানা থেকে এখানে আনার আগে আমি এদের চিনি। তখন ঝক ঝক করত। মেঝেয় আর দেওয়ালে পড়ত ছায়া।

আমি তখন শিক্ষানবিস ইঞ্জিনিয়ার, কত না গর্বভরে আমি চওড়া সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতাম, শব্দ-মুখর করিডোরের ভিতর দিয়ে ছুটে যেতাম। চারদিকে জাফরি-কাটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালা ছিল প্রতি বাড়িতে। তারা যেন স্ফটিকের মতো শাদা ছিল। আমার কাছে তখন কারখানাটা শুধু কারখানা নয়, শিক্ষাকেন্দ্র। সে যেন এক জগৎ, যেখানে আমি আনন্দে কাটাতাম।

প্রতি মুহূর্তে নতুন-কিছু আমি তখন শিখেছি। নতুন বন্ধুও জুটত প্রতিদিন। সেখানেই আমি বালিকা থেকে একদিন পূর্ণতা পেলাম, সামনে আমার উজ্জ্বল সুখময় ভবিষ্যৎ।

লোকে বলত আমি নাকি ভারি আমুদে, লোককে আপন করে নিতে জানি। তারা ঠিকই বলত। সেই সময়, সেই অবিস্মরণীয় দিনে আমি ছিলাম সামাজিক আর ভারি চঞ্চল। বহু বন্ধু ছিল, এক কথায়, সবাই ছিল আমার বন্ধু। সবাইকে ভালবাসতাম, সবাই আমাকে ভালবাসত।

কিন্তু সেদিন তো রইলনা। ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল সে দিনগুলি।

হাঁ, নিনা পেত্রভ্না বলল, বাতাসে মিশে গেছে। তাদের অনেকেই আজ নেই, নতুন লোক এসেছে কারখানায়। খাপ খাইয়ে নেওয়াই শক্ত...

কারখানার সবাইকে তখন চিনতাম, সবাই চিনত আমাকে। ঘুরতে ঘুরতে যেখানে গিয়ে হাজির হতাম, আমরা পুরনো বন্ধুভাবেই সম্ভাষণ জানাতাম। আগেই জানতাম, কে কি বলবে, কার প্রশ্নের কি উত্তর দেব।

জিনাইদা কনস্তান্তিনোভ্না ভোরনিষ্টস্কায়ার কথাই ধরুন না। ওকে সবাই জিনা মাসী বলে ডাকত। মোটাসোটা, বয়স্ক স্ত্রীলোক, গিন্নী মানুষ, সবসময়েই ফিটফাট। তার বেঞ্চির ওপর খবরের কাগজ ঢাকা একটা ফুলদানি থাকত। তাতে ফুল থাকত কখনো-বা সবুজ পাতা-ভরা ডাল, আর থাকত একখানা খোলা বই।

লাঞ্চের সময় জিনা মাসী বই পড়তেন। মোটা নাকে চশমা পরতেন তিনি। তার মুখখানা ভারি মিষ্টি, ব্যবহারও তাই।

আমি আর সবার মতোই সম্ভাষণ জানাতাম :

কিগো জিনা মাসী, রান্নাঘরের ষ্টোভ ভালো, না কারখানার বেঞ্চি ভালো ?

কারখানার বেঞ্চিই ভালো, জবাব পেতাম, মুখের দু'পাশে কথা বলার সময় রেখা দেখা দিত।

আমি এই বর্ষিয়সী বুদ্ধিমতী মহিলাকে চিনতাম। তিনি ছিলেন নাম করা এক ডাক্তারের স্ত্রী, ছেলেপুলের মা, সুগৃহিণী। হঠাৎ তার বুড়ো বয়সে তিনি একা পড়ে গেলেন। তিনি বুঝেছিলেন, দেশকে সাহায্য করা দরকার, তাই কারখানায় কাজ করতে এলেন। কিন্তু কখনো সেকথা মুখ ফুটে বলতেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন :

ঘরে বড় একা ছিলাম, তাই কাজ করতে এসেছি। অন্যের মতো আমিই-বা কাজ করবনা কেন? তাছাড়া, কাজ তো তেমন শক্ত নয়, আর জায়গায়টাও বেশ ভালো লাগছে।

খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে তিনি পারতেন না, কিন্তু তার যা কাজ তিনি নিয়মিত করে যেতেন, এতটুকু খুঁত থাকত না। তাকে দেখে আমার কেমন শ্রদ্ধা হোত, মন ভরে উঠত।

তিনি বেয়ারিংগুলো রেখে আমার দিকে তাকালেন সেদিন: নিনচ্কা, আজ যেন তোমার কি হয়েছে! শরীর ভাল নেই নাকি?

তাঁর প্রশ্ন যেন তীক্ষ্ণ ছুরি হয়ে বিঁধল আমার বুকে।

না, কিছু তো হয়নি।

আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এলাম একটা জরুরী কাজের অজুহাতে। দৌড়ে কোথাও গিয়ে তাড়াতাড়ি লুকোতে চাইলাম, একা থাকতে হবে আমাকে। এমনি সময় কে একজন ডাকল। আমাদের সরবরাহ বিভাগের কর্তা মিস্ক। খুব জোরে কথা বলে, মাথাটা তার অদ্ভুত। টাক পড়েছে, কেমন যেন তরমুজের মতো দেখতে। সে কি শীত-গ্রীষ্ম কখনো টুপি মাথায় দেয়না, একা পুরু কামিজ সব সময়ে পরে, তার নিচে উঁকি মারে উটের লোমের গেঞ্জি।

মিস্ক সবসময়েই ভীষণ ব্যস্ত, তাকে চার পাশে ঘিরে থাকে নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

তার ভ্রূ খুব কালো, আর ঘন আর তারই নিচে চোখ দু'টো জ্বলছে।

বাছা, খুব উত্তেজিত হয়ে সে বলল, আমাদের আর একটু সাবধান হতে হবে, এমনিভাবে তো চলবে না। আমি আর বল বেয়ারিং-এর যন্ত্র সরবরাহ করছি না, হাতে আরো দু'টা আছে। কিন্তু

তোমরা যা করছ তাতে আমাদের সর্বনাশ হবে। জানো, এখন আরকের কি দাম? সোনার দাম। পাখির দুধের মতো দুষ্প্রাপ্য, আর এখানে কারখানার সবাই আরক দিয়ে পা ধুচ্ছে। আমি বলে দিচ্ছি, সে চিৎকার করে উঠল, পনেরোই এপ্রিলের আগে তোমরা আমার কাছ থেকে আর মাল পাবেনা। যা খুশি তাই করগে, কি, বুঝলে তো? হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা।

তার পরে তার মনটা নরম হয়ে এল। কোমল স্বরে সে বলল, নিনচ্কা, সব ভাল তো? কি লিখেছে ও? তার স্বরে বন্ধুত্বের উষ্ণতা। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে আমাদের বিভাগ থেকে সে বেরিয়ে গেল। তার পেছনে ছুটল দালাল আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

আবার আমি একা··· হতাশা আর ভয় আবার নতুন করে পেয়ে বসলো আমাকে। মন যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে, একটা অসহ্য ব্যথা যেন অনুভব করলাম। আজকে সে কথা মনে করতেও ভয় হয়।

নিনা পেত্রভ্না চুপ করলেন। একটা হাউই দিগন্তে আস্তে আস্তে উঠেছে, আবার নিবে গেল, তিনি দেখছেন। আমাদের পূর্বদিকের গিরিপথে হঠাৎ উঠল বিস্ফোরণের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে কামানের শব্দ। গোলা চ'লে গেল অনেক উপর দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে এল গোলার চিৎকার। আবার দূরে পশ্চিমে শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ, আবার সব শান্ত।

কি ব্যাপার? নিনা পেত্রভ্না জিজ্ঞেস করলেন।

বোধহয় পাল্টা গোলাগুলী চলছে, আমি বললাম।

তিনি তার কাহিনী বলতে শুরু করলেন। কোন শ্রোতার কাছে বলছেন না, নিজেই যেন অতীতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আপনাকে সত্যি বলছি, আমার তখন একা থাকতে ভয় করত। মনে হোত, জীবন শেষ হয়ে গেছে, এমন-কিছু নেই যার দাম আছে আমার কাছে। নিজেকে ভয় হোত সব চাইতে বেশি। আমি তখন যেন এক মহাসংকটের প্রান্তে এসে পড়েছি।

অতীত আমাকে বাঁচাল, বর্তমান নয়। স্মৃতিময় জীবন। সেখানে আমার আন্দ্রে আমার সাথী, জীবন্ত আন্দ্রে। সে আমাকে ভালবাসে, ভালবাসাও সে পায়। আমার চেতনার গভীরে এই স্মৃতিময় জীবনের ঢেউ বইল, স্পষ্ট হয়ে উঠল সে জীবন, আমি তার ভিতরে ডুবে গেলাম, আমি নিজেও তখন এক মূর্তিমতী কল্পনা। তখন একটা কথা, একটা শব্দ, একটু গন্ধ, আমার কল্পনায় অতীতের সুখের দিনের ছবি জাগিয়ে তুলত। প্রথমে আমার স্মৃতি ছিল এলোমেলো, জটিল: একটা জায়গায় এসে কল্পলোক শেষ হয়ে যেত, তারপর চলত তারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার এল পরিপূর্ণ তন্ময়তা। তখন আমি মস্কৌতে। গ্রীষ্মের এক উত্তপ্ত বিকেল। জুলাই মাস। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যখন ট্রামের জানালা গাড়ির নিকেলের অংশে চলমান সাইকেলের ছায়া ঘুরে বেড়ায়···

সেদিন বিকেলে মস্কো ট্রেডিং কোম্পানীর সেই গরম আর গোলমালে-ভরা দোকানে একটা ফাইবারের সুটকেশ কিনছিলাম···

—০—

[ছয়]

যুদ্ধের দু'বছর আগের কথা, আন্দ্রের সঙ্গে তার কিছুদিন পরেই দেখা হয়। সেবার গ্রীষ্মে আমি আর এক ছাত্রী বন্ধু ক্রাইমিয়ার এক গ্রীষ্মাবাসে থাকবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। এখন ভাবলে ভারি অদ্ভুত লাগে, এই নিয়ে কত হৈ চৈ আমরা করেছি। সেই প্রথম আমি মস্কৌ থেকে বহুদূরে গেলাম।

নিজেকে আমি স্বাবলম্বী বলেই জানতাম, কিন্তু তবুও এই দূরদেশে যাত্রা আমার কাছে দুঃসাহসিক অভিযান বলেই মনে হোল। আমি যেতামইনা, কিন্তু আমার বন্ধু ডুসিয়া ছাড়লনা। ডুসিয়া ভারী স্বাধীনচেতা মেয়ে, বয়েসও খুব কম নয়, তখন তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওর বয়েস তখনো বাইশ পোরেনি, তখনই তার এক প্রেমিক জুটেছে। আমার তখন উনিশ, কারো প্রেমে পড়িনি।

আমরা রওনা হলাম।

মনে আছে কার্স্ক ষ্টেশনে একটা ফালি পথের ধারে বসেছিলাম, তারই পাশে ব্যুফে। আমার ফাইবার স্যুটকেশের উপরই বসেছিলাম, স্যুটকেশে একমাত্র দামী জিনিস আমার রেশমী পোশাকটা।

গরমে ভারি অস্বস্তি লাগছিল, ভয়ও হচ্ছিল। শেষে ডুসিয়াকে ভিড়ের ভিতরে দেখতে পেলাম, দেখে আনন্দে কেঁদেই ফেললাম। দুজনে নেমে এলাম সুরঙ্গ দিয়ে, ছুটে চললাম, কিজানি যদি গাড়ি ছেড়ে দেয়। কিন্তু তখনো গাড়ি ছাড়তে বিশ মিনিট বাকি।

আমাদের জায়গা খুঁজে নিলাম গাড়িতে, তারপর হাল্কা স্যুটকেশটা

রাখলাম উপরের র‍্যাকে। এবার আবার প্ল্যাটফর্মে নেমে এলাম। ট্রেন থেকে বেশিদূরে যেতে সাহস হোলনা, গাড়িতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, পিঠে লাগছিল গাড়ির উত্তাপ।

বহুলোক গাড়িতে চড়ছে, কোন শৃঙ্খলা নেই। স্ফূর্তির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আপনি তো জানেন, যুদ্ধের আগে ছুটি নিয়ে সবাই যখন দক্ষিণে যেত, কত সুখী আর নিশ্চিন্ত ছিল তারা। সেবাস্তপুল থেকে যারা উঠলো সবাই ছুটি উপভোগ করতে চলেছে। সবাই অল্পবয়েসী, আমার আর ডুসিয়ার মতো ছাত্রী, নয়তো কারখানার শ্রমিক। অনেকে তাদের তুলে দিতে এসেছে। তারা যাত্রীদের চাইতে বেশি গোলমাল করছে। তারা গাড়িতে উঠতে চায়, কিন্তু ট্রেনের কণ্ডাক্টার কিছুতেই দেবেনা।

ডুসিয়ার পুরুষ বন্ধুটিও বিদায় দিতে এল। এই তাকে প্রথম দেখলাম। অল্প বয়েস, হালকা নীল রঙের পাতলুন তার পরনে, লীলাক রঙের স্পোর্ট সার্ট গায়ে, একটা কোট কাঁধে। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ডুসিয়ার কাছে। তারা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি শুরু করল। ভিড়ের জন্য পাশাপাশি চলতে পারছে না, ডুসিয়া সামনে, সে পিছনে। কি যেন তারা বলছে, দুজনেই একেবারে বিভোর। ছেলেটি কেমন উদ্বিগ্ন, ডুসিয়ার মুখে বিরক্তির ভাব, কি একটা ব্যাপারে তারা অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি জানতাম, শ্রমবিভাগ থেকে ওকে একটা আলাদা ঘর দেওয়ার কথা ছিল বহুদিন আগে। সেই ঘরটা ঘিরে বিয়ের পরে তাদের পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল।

আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম, কেউ আমাকে বিদায় দিতে আসেনি। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু একটুও দুঃখিত হইনি, বরং কেমন যেন একটা আবেগ আমার মনের গভীরে উথলে উঠছিল।

এযেন এক অকারণ আনন্দ, এক সর্বনাশা সুখ, সেই তো বয়ে নিয়ে আসে আসন্ন প্রেমের বার্তা। তখনো প্রেমিকের কোনো অস্তিত্ব নেই, তবু ভালবাসা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, আমি তারই ভিতরে ডুবে গেলাম, এক চমৎকার অবস্থা—এমনি অবস্থা জীবনে একটিবারই আসে।

হঠাৎ দেখলাম বাবা আসছেন, প্রতি গাড়িতে দেখছেন উঁকি মেরে। আমাকেই খুঁজছেন। এ-এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার চোখের দিকে তাকালেন, গাল চাপড়ে দিলেন আদর করে। তাঁর হাতে তখনো লোহা-লক্কড়ের গন্ধ। তাঁর পাঁচটা আঙুলের স্পর্শ আমি অনুভব করলাম, মাঝখানের আঙুলটা মেশিনে কেটে গেছে, তাই একটু ছোট। আমার দিকে তিনি তাকালেন আনন্দে বিহ্বল হয়ে। চোখের দৃষ্টি তাঁর ক্লান্ত, তবে কেমন একটা স্বচ্ছ ভাব দেখা দিয়েছে। তখনই বুঝতে পারলাম উনি একটু মদ খেয়ে এসেছেন। খুব খুশি তাঁকে মনে হোল।

তিনি বল্লেন, খুকু, তুমি স্বাস্থ্যাবাসে চলেছ, বেশ, বেশ। খুব দরকার, আমাদের সরকার তো সেই কথাই বলেন। প্রতি মানুষেরই মাঝে মাঝে এমনি ঘুরে আসা দরকার, ছাত্রদের তো বটেই।

তিনি কথাগুলো বলছিলেন, আর চারদিকে তাকাচ্ছিলেন, যেন সবাইকে ডেকে তিনি তাঁর গর্বের কথা বলতে চান, গর্ব তো তার হবেই। তাঁর মেয়ে একজন ছাত্রী, দ্বিতীয়ত সে চলেছে ছুটিতে ক্রাইমিয়ার এক স্বাস্থ্যাবাসে। তিনি আমাকে খুদে খুকু মনে করে এবার নানা উপদেশ দিলেন, বল্লেন, আমি যেন কখনো খালি মাথায় ওখানে [illegible] রেখেই, অন্তত একটা রুমালও যেন বাঁধা থাকে। আমার চোখের [illegible] ভেসে উঠল স্বাস্থ্যনিবাসে মাথায় রুমাল বাঁধা নিনা পেত্রভ্নার ছবি। হাসলাম। তিনি এবার চুমু খেলেন।

টাকাকড়ি কিছু আছে তো? তিনি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

হাঁ, আছে।

বেশ কিছু আছে?

একশো বিশ রুবল।

তিনি এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে বললেন, খুব কমই তো, এই যে আরো পঞ্চাশ দিচ্ছি, এখন একশো সত্তর হোলো, এবার যাহোক টাকাটা মন্দ নয়।

আমার হাতে তিনি একটা ছোট নোটের তাড়া গুঁজে দিলেন। নোটগুলো একটু কেমন ঘামে ভেজা, তিনি মাইনের দিন মাকে এই ক'টা টাকা দেন না, সপ্তাহে দু'একবার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিয়ার পানের খরচ এতেই চলে। আমি তাকে এই আমোদটুকু থেকে বঞ্চিত করতে রাজি নই, যাতে টাকাটা না নিতে হয় সেই চেষ্টাই করলাম।

নাও, তিনি গম্ভীর স্বরে তাঁর কাটা আঙুলটা তুলে বললেন, তোমাকে যখন দেওয়া হচ্ছে, নিয়ে নাও, স্বাস্থ্যনিবাসে দু'এক টাকা হাতে বেশি থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না। খুব ফল কিনে খেয়ো, মাথার কাজের পক্ষে ফল খুব ভালো।

তিনি আবার গর্বভরে তাকালেন চারদিকে। ঘণ্টা পড়ল। আমি বাবাকে একবার জড়িয়ে ধরলাম, তারপর ছুটে গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। ডুনিয়া ছুটে এল আমার পিছনে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। বাবা বাইরে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে টুপি দোলাচ্ছেন। তাঁর চোখে চকচক করছে জল, তিনি চিৎকার করে বললেন, যদি কোনো অসুবিধে দেখ, তার করবে।

—x—

[সাত]

সন্ধ্যে আটটা, তবু সূর্য এখনো আকাশে। গরমে আর ভিড়ে গাড়ির ভিতরে নিশ্বাসটুকু নেওয়া পর্যন্ত অসম্ভব। কেউ কেউ জানালা খুলে দিতে বলল, কিন্তু জানালা খোলায় আরো অস্বস্তি বাড়লো, একরাশ ধুলো উড়ে এল ভিতরে। আবছা দেখতে পেলাম মস্কোর শহরতলীর বাড়িগুলো, পাইন গাছের সার, ভলি-বলের নেট, খাবারের দোকান, এমনি আরো কতো-কি!

দু'দিন দু'রাত কাটালাম ট্রেনে। প্রথম রাতে চোখের পাতা এক করতে পারলাম না! ডুনিয়া ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু আমি পারলাম না! হাওয়া যেন রাতে আরো গরম বলে মনে হোল। ঘাম ঝরছিল, রাতে কয়েকবার জল খেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু জলও গরম। আমার তেষ্টা কমল না, বরং আরো বেড়ে গেল।

সময় কাটাবার জন্য ঘণ্টা দেড়েক গার্ডের গাড়িতে এলাম! মিটমিটে করে আলো জ্বলছে। ব্রেক কষার চাকাটার কাছে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। জানালার বাইরে জমাটবাঁধা কালো কালো আকৃতি দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। হয়তো গাছপালা, মেঘ কি বাতি হবে। বহু নিচে এক রাতের নদীর সাদা জল দেখতে পেলাম। উপরে আকাশে বিলম্বিত চাঁদ, আর নিচে রূপোলা রেখার মতো জল।

দূরে আলোর বিন্দু দেখা দিল। তারা ধারে ধারে এগিয়ে আসছে কাছে। ক্রমে ক্রমে বিন্দুগুলো পুঞ্জীভূত।বজ্বলা আলো হয়ে দেখা দিল। হঠাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়লো আঁধারে, গর্জন আসছে যন্ত্রের। আমরা একটা কারখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এখানে লোহা গালাই হয়। আবার অন্ধকার। উজ্জ্বলতা মিলিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে

আলো। এমনকি আঁধারে ট্রেনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীও আর দেখা যায় না।

এক অবিশ্বাস্য নিঃসঙ্গতা আমাকে পেয়ে বসলো। কি ছেলেমানুষ ছিলাম আমি! সত্যিকারের নিঃসঙ্গতার ব্যথা তো তখন জানতাম না!

আমার তখনই মস্কো ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এ-কামনা বেশিক্ষণ রইল না। সূর্য উঠতেই চারদিক্ ঝলমল করে উঠল। যাত্রীরা জেগে উঠেছে। আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ হোল। একটা দাবার ছক পাতা হোল। কে একজন একটা নীল ফিতে বাঁধা গীটার বা'র করলো। কেউ কেউ বা খাবারের পুঁটলি খুলছে। এক উজ্জ্বল আনন্দময় দিন শুরু হোল গাড়িতে, চিন্তা ভাবনা নেই, মন্থর গতিতে চলছে দিন।

আমাদের ভাগ্য ভালো। ঝড় এল, গাড়ি বর্ষাধারার ভিতর দিয়ে ছুটে চলল। জানালা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিশুদ্ধ হাওয়া ভিজে মাটির গন্ধ নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। প্রায় ওরেলের কাছাকাছি এসেছি। একবার ভেবে দেখুন! ঠিক এইখানে। সেদিন যে মাঠ থেকে ভিজে মাটির গন্ধ পেয়েছিলাম, সে মাঠ হয়তো আজ আমরা পার হয়ে এলাম।

এক মুহূর্তের জন্য তার স্বরে দেখা দিল তিক্ততা। বর্ষার সময়ে গাড়িতে বড় আরাম, তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, তিক্ততা এড়াবার জন্যই বোধ হয় তাড়াতাড়ি বলতে লাগলেন। বন শেষ হয়ে এল। খারকভের পরে শুরু হোল দিগন্ত জোড়া শস্যের ক্ষেত, শস্য পেকে উঠেছে তখন। এখানে ওখানে যবের চারাগুলো বর্ষায় নুয়ে পড়েছে। সেই প্রথম দেখলাম ইউক্রাইনের চাষীর কুটীর, চেরী গাছ-ঘেরা কুটীর।

একটা ট্রাক্টার মাঠে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। তার তীক্ষ্ণ দাঁতালো চাকা নীলচে-কালো কাদায় ভর্তি। গতবছরের খড়ের গাঁদা, একদিক শুকনো, ধূসর রং তার, আর একদিক বৃষ্টিতে ভিজে হলদে হয়ে গেছে।

তার ওপরে বসে আছে ক'জন ইউক্রাইনের অধিবাসী। একটা হাল্কা নীল ধোঁয়া উঠছে……

তখন ভাবতেও পারিনি যে দু'বছরের ভিতরে জার্মানরা আসবে সেখানে। তারা লুট করবে, পুড়িয়ে দেবে, নিরীহ অধিবাসীদের করবে বন্দী, এই শান্তি আর সুখের দেশকে, এই সজীব সমৃদ্ধ ভূমিকে তারা ভস্মস্তূপে পরিণত করবে। কি করে জানব তখন যে, আমার দেশকে শীগ্‌গীরই সইতে হবে এই ভীষণ দুঃখ? আমার আত্মা তখন পবিত্র, সরল, সত্য শিব আর সুন্দরের বিশ্বাসে সে পূর্ণ। সুখের আশায় আমি তখন চলেছি ছুটে।

রাতের আগে ট্রেন এসে থামল সিনেলনিকোভো ষ্টেশনে। বর্ষার রাজ্য আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। ডুসিয়া আর আমি একটু বেড়িয়ে আসার জন্য ষ্টেশনে নামলাম। সূর্য মেঘের ফাটল দিয়ে উঁকি মারছে, নির্মল আকাশের এক টুকরো ছায়া এসে পড়েছে একটা বড় জলভরা গর্তের ভিতরে। ডুসিয়া ষ্টেশনের ডাকবাক্সে কয়েকটা পোষ্টকার্ড ফেলল। এইগুলো সে পথে লিখছিল। এবার ইণ্টারন্যাশনাল কার জুড়ে-দেওয়া হবে আমাদের গাড়ির সঙ্গে। আমরা দেখতে গেলাম।

বিরাট গাড়িটার সামনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল। টুপি পরা সবাই, তাদের স্পোর্টস্ পোশাকের উপরে কালো আর সাদা বর্ষাতি ঢাকা।

এরা ইণ্টারন্যাশনাল টুরিষ্ট—ডুসিয়া ফিস্ ফিস্ করে বলল। ও দুনিয়ার সব কিছুই জানে।

আমরা যেতে যেতে ওদের দিকে একবার ফিরেও তাকালাম না। জার্মান ভাষা কানে এসে পৌছলো। ওদের চোখের দৃষ্টি তবু অনুভব করছিলাম। ফিকে নীল চোখ, আমাদের দেশের লোকের মতো ঘন নীল নয়, কেমন এক উলঙ্গ কৌতূহল নিয়ে ওরা আমাদের দিকে

তাকিয়ে ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে চললাম। একটা গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, কার স্বর শুনতে পেলাম, কোনো আমোদপ্রিয় তরুণেরই হবে। ওগো মেয়েরা, একটু দাঁড়াওনা। এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছ ?

আমরা থেমে পড়ে তাকালাম। একটা খোলা জানালা দিয়ে নাক বোঁচা এক ছোকরা হাসছে, তাব চুলে এখনো নাপিতের জাল ঢাকা। চোখ দু'টো তাব দুষ্টুমি ভরা। সবে বোধ হয় দাড়ি কামানো শেষ হয়েছে, একখানা ফর্শা টার্কিস তোয়ালে তার কাঁধে, গলায় পাউডারের দাগ।

সে আমাদের দু'জনেব মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিল, অভদ্রতার লেশ মাত্র নেই তার চাউনিতে, ববং সাহস আছে। সে যেন আমাদের দু'জনেব ভিতরে একজনকে বেছে নেবে। তারপর শিস দিয়ে চিৎকার করে উঠল, হাঁ, চমৎকার মেয়ে বটে!

আমরা কোন কথা বললাম না। তাবপর সে জিজ্ঞেস করল: মাপ কর, আচ্ছা বলতে পার, এটা কোন্ ষ্টেশন ?

ডুসিয়ার খুব উপস্থিত বুদ্ধি, কখনো জবাব দিতে ভাবতে হয় না। সে বলল : এই সেই ষ্টেশন যেখানে চায়ের জন্য গরম জল দেওয়া হয়।

ঠাট্টা করছ না তো ? তার স্বরে তিরস্কারের আমেজ।

পড়তে পার না ? তোমার চোখের সামনেই তো লেখা রয়েছে সিনেল নিকোভো। কি দেখতে পাচ্ছ না ?

মাপ কর, চশমা ভুলে ফেলে এসেছি। তোমরা কি এই শহর থেকে আসছ ?

আমরা দু'জনে ক্ষেপে গেলাম। তুমিও যেমন এখানকার নও,

আমরাও নই। ডুসিয়া বলল।

সত্যি !

আমরা এই ট্রেনে বহুদূর থেকে আসছি।

সত্যি ? আমার কৌতূহল ক্ষমা কর, কোন্ গাড়িতে আছ তোমরা ?

তোমার জেনে লাভ কি ?

দেখা করতে যাব।

আমাদের খুঁজে পাবে না।

না, না, সত্যি করে বল, কোন্ গাড়ি ?

ঐ যে —

যাক গে, খুজে নেব'খন।

বোধ হয় পারবে না।

দেখো।

না, পারবে না।

কোথায় যাচ্ছ ?

তুমি যেখানে যাবে।

ক্রাইমিয়া ?

চাঁদের দেশে।

স্বাস্থ্যনিবাসে ?

তোমার তো জানবার দরকার নেই।

হাঁ, দরকার আছে বইকি। বল, কোথায় যাবে ?

অতো কৌতূহলা হওয়া ভালো নয়।

ওটা আমার স্বভাব, বল কোথায় যাচ্ছ ?

নিজে অনুমান করে নাও।

ইয়াল্তা ?

না, বড্ড বেশি খরচ ওখানে যেতে।

আলুপ্‌কা।

সে আবার কোথায় ?

মিস্কর ?

কখনো নামও শুনি নি।

তাহলে লিভাদিয়া।

হাঁ, তাই হবে।

আমি বাজি রাখতে পারি।

বাজি হারবে কিন্তু।

তাহলে কোথায় ?

আন্দাজ করে নাও।

লক্ষ্য করছিলাম, ডুসিয়ার সঙ্গে সে কথা বলছিল কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েছিল সারাক্ষণ। আমাকেই যেন সে প্রশ্ন করছে, ডুসিয়াকে নয়। এটা পরিষ্কার বোঝা গেল, আমিই তাকে বেশি আকৃষ্ট করেছি। মেয়েরা, খুব ছোট হলেও এসব ব্যাপারে ভুল করে না। আর সত্যি বলতে কি, সেই সময়ে আমি সত্যিই সুশ্রী ছিলাম। আহা, সেদিন তো আর ফিরবে না! হঠাৎ খুব খুশি হলাম। ইচ্ছে হোল দু'একটা জবাব দিই। বলতে যাচ্ছিলাম, আমরা রিয়ো দ্য জেনেরিও যাচ্ছি, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল আর একজন একই জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখে চোখ মিলল। তার চোখ নীল, কেমন এক সহৃদয়তা ফুটে উঠেছে সেখানে। মুখের রেখায় চরিত্রের দৃঢ়তার ছাপ। সুন্দর চুল পিছন দিকে ফেরানো, মাঝখানে চেরা সিঁথি। বাগ-না-মানা চুল এলিয়ে পড়েছে কপালের দু'পাশে, মুখে একটা পাইপ। সে পাইপটা নামিয়ে ভোলগার উপকূলের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বলল:

পেতিয়া, আশা ছেড়ে দাও। তোমার ছলাকলায় এবার কাজ হোল না। তারপর সে সোজা আমার দিকে ফিরে বলল, ঠিক বলিনি ?

কেমন ভয় পেলাম। লাল হয়ে উঠল মুখচোখ, ভুসিযাকে হাত ধরে টেনে বললাম, যথেষ্ট হয়েছে ভাই, এবার চল ফিরি!

দু'জনে হাত-ধরাধরি করে চলে এলাম। পেতিয়া আমাদের পেছন থেকে কত ডাকল, আমরা ফিরেও তাকালাম না।

পরের ষ্টেশনে, কয়েকবার উদ্বিগ্নভাবে আমাদের কামরার জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল। নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজ সে করছিল। তার মাথায় তখন আর জাল নেই, চমৎকার একটা ঘন-নীল টুইডের স্যুট তার পরনে, কোটের উপর সামরিক সম্মান-চিহ্ন আঁকা। আমরা এককপাশে এমনভাবে বসে রইলাম, যা'তে সে জানালা দিয়ে দেখতে না পায়। দু'জনে দু'জনের গলা জড়িয়ে ধরে খুব হাসলাম।

এই ব্যাপারটায় আমাদের ফূর্তি আরো বেড়ে গেল। সে রাতে ঘুম ভালোই হোল ঃ স্বপ্ন দেখিনি। সবসময়েই মনে হচ্ছিল, আমার মনে কি যেন একটা ঘটে গেছে। ব্যাপারটা খুবই বড অথচ কি যে, ঠিক জানি না।

[আট]

দেরি করেই ঘুম ভাঙলো। আকাশ আর দৃশ্যের পরিবর্তন দেখে অবাক হ'লাম। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, গাড়ির ভিতরে জানালা দিয়ে ঢুকছে হাওয়া, চুল উড়িয়ে দিচ্ছে। এক সার পপলার দূরে দেখা যাচ্ছে, পিরামিডের মতোই বিরাট গাছের সার। ছোট ছোট, দিব্যি সাজানো

ষ্টেশন, বাড়িগুলো ঢাকা পড়েছে আঙুর লতার ঝোপের আড়ালে, ঠিক প্রদর্শনী-বাড়ির মতো। প্ল্যাটফর্মের উপরে তাতাররা ঘোরাফেরা করছে। তাদের পায়ে সাদা চামড়ার মোজা।

এক জায়গায় একটা মসজিদ দেখলাম; আর এক জায়গায় দেখলাম গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে হলদে রংএর তরমুজ চলেছে।

বাঘচী সরাই, কথাটার ভিতরে কি যেন যাদু আছে। মনে করতেই আনন্দে মন নেচে ওঠল। রেল লাইন পাহাড় কেটে পাতা হয়েছে, এখানে-ওখানে উঁচু পাহাড়ের উপরে বুনো ফুলের ঝোপ, গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। চারিদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, তারই ভিতর দিয়ে এক ফালি আকাশ মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আকাশের নীল ছায়া ঝুঁকে পড়েছে পাহাড়ের উপর, তাই পাহাড়ের রংও নীল।

হঠাৎ সেই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের দেশ কত বড়। আমি বইয়েই পড়েছিলাম, কিন্তু কখনো তো এমনি করে চোখের উপর ফুটে ওঠেনি। এবার বুঝলাম কি অসীম তার বিস্তার। রাশিয়া আর উইক্রাইন পেরিয়ে এবার চলেছি ক্রাইমিয়ায়। নতুন আকাশ, নতুন মানুষ, নতুন জগৎ। আর একদিন কি, দেড়দিন পরেই দেখব কৃষ্ণসাগর।

আপনি উত্তরে গেলেই তুন্দ্রা দেখতে পাবেন। চিরন্তন বরফের দেশ, উত্তরের আলো আর বলগা হরিণ আছে সেখানে। পূবে যান দেখবেন ভলগা, বালুময় মরুভূমি আর উটের সার আর তুলোর ক্ষেত ভরা উপত্যকা। উরাল পর্বত পেরিয়ে, সাইবেরিয়ার মরুভূমির উপর দিয়ে গেলেই আপনি পাবেন বৈকাল হ্রদের অঞ্চল। হাজার হাজার মাইল ধরে এমনি করে ছড়িয়ে আছে আমাদের দেশ। সুখী আর সমৃদ্ধ দেশ!

হঠাৎ অন্ধকার আমাদের ঘিরে ফেলল। ট্রেন সুড়ঙ্গ পথে চলেছে,

আবার এক মুহূর্ত পরেই রোদ। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। আর একটা সুড়ঙ্গ, আর একটা। এমনি করে একবার চোখ ঝলসানো রোদ আর একবার গুমোট অন্ধকারের ভিতর দিয়েই শুরু হোল যাত্রা। কিন্তু অবশেষে, এই ক্লান্তিকর রোদ আর আঁধারের খেলা শেষ হয়ে গেল। ট্রেন শেষ সুড়ঙ্গ পার হয়ে এল। আমি জানালার কাছে ছুটে গেলাম। চিৎকার করে উঠলাম আনন্দে। আমার সুমুখে, বহু নিচে সেবাস্তপুল উপসাগর বিছিয়ে আছে। সাগর-তো নয়, সবুজ এক বনমায়া যেন!

কয়েকটি জাহাজ উপসাগরে, দূরে সমুদ্রের মুখে একটা মানোয়ারী জাহাজের চোঙা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

দশ মিনিটের ভিতরেই একজন গাড়োয়ানের সঙ্গে ভীষণ দরদস্তুর শুরু হোল। আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস জর্জেইভ্‌স্কা মঠে নিয়ে যাবে।

হাঁ, তা'হলে জর্জেইভ্‌স্কী মঠে চলেছ? আচ্ছা টুকে নিচ্ছি— কার স্বর শুনতে পেলাম পিছনে।

আমাদের কালকের সেই ফূর্তিবাজ পেতিয়া। সে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, বর্ষাতি ভাঁজ করে হাতে নিয়েছে, একটা বড় মোটরের দিকে চলেছে। মোটরটার সারা গা ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে।

আমরা যাচ্ছি। আমাদের জন্য অপেক্ষা কোরো।

নিশ্চয়ই। তবে অন্য কিছু করবার না থাকলেই যেও, ভুসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলল।

গাড়ি মানুষ আর সুটকেসে ভর্তি হয়ে চলল। গাড়ির ভিতরে বিমান-বিভাগের উর্দিপরা কয়েকজনকে দেখতে পেলাম। তাদের ভিতরে পাইপ মুখে সেই লোকটিও আছে। আমার দিকে সে হাসিমুখে তাকাল, কেমন সলজ্জ হাসি যেন। গাড়িটা মিলিয়ে গেল সাদা ধুলোর ঝড় তুলে।

কেমন একটা আনন্দ যেন আমাকে পেয়ে বসল—কি তার তীব্রতা! ডুসিয়া আর আমি বসলাম গিয়ে টাঙায়।

স্তেপের উপর দিয়ে চললাম। ধুলো উড়ছে। দূরে সমুদ্রের কালো রেখা স্থল হয়ে ফুটে উঠেছে, মনে হয় কে যেন রুলার দিয়ে সবল হাতে টেনেছে রেখা। খারশোনেস্কি বাতিঘরের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে ছড়িয়ে আছে ঝিনুক আর শামুক, গাড়ির চাকায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে শব্দ করে। চূণের মতো সাদা গুড়ো ছড়িয়ে পড়ছে। হাওয়ায় ভিজে কাঠের গন্ধ। আমরা ক্লান্ত আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। আমরা চলেছি, আমাদের সুমুখে শূন্য স্তেপ বিছিয়ে আছে।

মস্কোতে বসে যেমনটি ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটি তো নয়। ডুসিয়া সাইপ্রেসের সার আর মারবেল পাথরের সিংহের কথা খুবই বলত। পরে জেনেছিলাম, এমনি সিংহ আছে বটে, তবে এখানে নয়। স্বাস্থ্য-নিবাসগুলো যেখানে আরো ভালো, সেখানে এসব মিলবে। কিন্তু তাই বলে আমাদের স্বাস্থ্যনিবাসটিও চমৎকার। আমি আমার জীবনে এমনটি দেখিনি।

বন্য স্তেপ হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি সুমুখে। আমরা প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু দিয়ে চলেছি। আমাদের নিচে হঠাৎ দেখা দিল সমুদ্র। এতদূর থেকে বোঝা যায় না সমুদ্র এখন শান্ত না উত্তাল। এত ছোট তাকে দেখাচ্ছে, ঢেউয়ের খাতে খাতে নিস্তব্ধ শান্তি যেন জড়িয়ে আছে; মনে হয় কে যেন খাঁজ কেটে দিয়েছে সমুদ্রের উপর। এ-যেন এক শূন্য পাথর কাটাইয়ের কারখানা। ভাল করে নিকানো হয়েছে; এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে বালি। সমুদ্র থেকে আসছে চমৎকার হাওয়া।

[নয়]

আমাদের স্বাস্থ্য-নিবাসটি আগে ছিল মঠের অতিথিশালা। মস্তবড় সাদা বাড়ি, ছাদ সবুজ রঙের। আমরা তে-তলায় একটা ছোট্ট ঘর পেলাম। বেশ পুরু দেয়াল, সন্ত কলি ফেরানো হয়েছে। জানালা আর বারান্দাগুলো সমুদ্রের দিকে মুখিয়ে। বারান্দা থেকে আমরা তাকিয়ে দেখলাম, একটা বাদাম গাছ। স্বাস্থ্য-নিবাসটি পরিচিত নয়। তাই লোকজন এখানে খুব কম। আমাকে নিয়ে মাত্র পনেরো জন লোক এখানে।

দু'সপ্তাহ ধরে আমরা রুচিমাফিক আলস্যে কাটালাম। কিন্তু একটুও একঘেয়ে লাগেনি। এই সময়ে হঠাৎ অসুখ করল। প্রথম দিন সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে অসাবধান হয়ে রোদ লাগালাম। ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হোল রৌদ্রাহত হয়ে। উত্তাপ ক্রমাগত বেড়ে চললো, গায়ের চামড়া পুড়ে যেতে লাগল। বিছানার চাদরে গা রাখতে পারিনা, কোথাও শুয়ে একটু আরাম পাব জানি না। ডুসিয়া ভেসিলিন আর বাদাম তেল গায়ে মেখে দিল, জ্বালা খানিকটা কমলো।

রাতে ভুল বকতাম, গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসত। মনে হোত চারদিকের সবকিছু যেন জ্বলন্ত আগুনে চাপানো, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। উজ্জ্বল চাঁদের আলো যেন আরো গরম বাড়িয়ে দিত। আমরা শহরের মানুষ, এমন আলো তো কখনো দেখিনি। গায়ের চামড়ার নিচে জ্বলছে, আর বুকে তখন চলছে [illegible]াড়, এক সুন্দর কামনা আত্মাকে পীড়ন করছে, কল্পনাকে ভরে দিচ্ছে। বুঝতে পারলাম, প্রেমে পড়েছি। কেউ তখন যদি সে কথা বলত, অস্বীকার করতাম, কেননা, আমি তো

জানতাম না তার স্বরূপ।

আরাম হোলাম। ডুসিয়া আমার পিঠ থেকে সিগারেটের কাগজের মতো পাতলা চামড়া তুলে ফেলল। নতুন গোলাপী চামড়া চুলকাতে লাগল, তা কি আরাম।—শুধু কাঁধের কাছে তখনো একটু জ্বালা রইল। মনে তখন ঘনিয়ে এসেছে উদ্বিগ্নতা আর আশা।

সাঁতরাতে গেলাম আবার।

শীগগিরই ছুটি ফুরিয়ে এল। ডুসিয়া আর আমি রোজই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম। আমাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গা ছিল, সেখানে টিলার আড়ালে আমরা পোশাক ছাড়তাম। তারপর খানিকক্ষণ বালির উপরে বসে জিরিয়ে নিয়ে পার দিয়ে চলতাম। এবার ঝাঁপিয়ে পড়তাম সমুদ্রে, সাঁতরে প্রায় একশো গজ দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে উঠতাম। পাথুরে জায়গাটা। আমরা মাঝে মাঝে সাঁতরে 'ডিনামো' ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়ে উঠতাম, এখানে তো নোনা জলে শরীর আরো তাজা হয়ে উঠত, আমরা জোর সাঁতরাতাম, কতরকম যে কসরৎ করতাম তার ঠিক নেই।

হাঁ, দ্বীপে পৌঁছে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়তাম, হাঁটু পাথরে যেত ছড়ে। কিছু দূরে একটা মাচা, তার উপরে একটু বেদীর মতো। সেখানে পাথরের উপর নির্জনে দু'জনে গা এলিয়ে দিতাম, গরম পাথরের উপর কখনো উপুড় হয়ে, কখনো চিৎ হয়ে শুতাম। সূর্যের তাপে আমাদের ভিজে পোশাক নিতান্ত শুকিয়ে।

এ-এক অতুলনীয় আনন্দ। ভাবতাম না, কথা বলতাম না, রোদ বাঁচাবার জন্য চোখ বুজে থাকতাম। ঝিমুনি পেত, ছোট ছোট ঢেউ আশেপাশে স্ফটিকের দীপ্তি ছড়িয়ে ভেঙে পড়ত আর তারই শব্দে আসত তন্দ্রা। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখতাম, ভ্রূতে জমাট বেঁধে আছে নুনের গুঁড়ো। দিগন্তের নীল রেখার দিকে তাকাতাম, একটা সরু

ধোঁয়ার রেখা উঠছে কোনো জাহাজ থেকে।

সেদিনও তেমনি শুয়েছিলাম। হঠাৎ সমুদ্র থেকে এল শব্দ। আমাদের দ্বীপের পাথরে পাথরে উঠল প্রতিধ্বনি। কিসের শব্দ ঠাহর করবার আগেই দেখা দিল একখানা মোটর বোট। আমার বুক কেঁপে উঠল, কে যেন বলে দিল : সে এসেছে।

তিনজন লোক বটে। একজন চিৎকার করে উঠলো, এবার তোমাদের ধরে ফেলেছি। হঠাৎ ঘুরে বোটটা সোজা আমাদের দ্বীপের দিকে আসতে লাগল। একমুহূর্তে গলুই এসে ঠেকল দ্বীপের পাথরে, পেড্রিয়া লাফিয়ে নেমে পড়ল, পেছনে তার বয়স্ক বন্ধুটি। দু'জনেরই পরনে সার্ট আর পাজামা। বন্ধুটির মাথায় টুপির মত করে রুমাল বাঁধা।

রোদে পুড়ে তার রং তামাটে হয়ে গেছে, একটু রোগাও মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে বেশ কম বয়সী বলেই মনে হয় তাকে। সে তাকাল আমার দিকে, তেমনি সলজ্জ ইঙ্গিতময় হাসি। তার সেই মধুর হাসি আমাকে কথার থেকেও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল, তার চিন্তা এখন আমাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, সে আমার সঙ্গে পরিচয় করতে উদগ্রীব। আমি আনন্দ চেপে রাখতে কোনো চেষ্টাই করলাম না। হাসলাম, আমার হাসি তার কাছ নিয়ে এল উত্তর।

মিনা পেদ্রভ্না থামলেন।

তারপর ? জিজ্ঞেস করলাম।

কি সুখের দিন এলো আমাদের, তিনি শুরু করলেন, তিনি চিৎ হয়ে শু'লেন, তার হাত দু'টোর উপরে রাখলেন মাথা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন আমাকে যা কিছু বলছেন, সব ছবির মতো ফুটে উঠছে চোখের সামনে।

আমরা হেসে করমর্দন করলাম। কি আন্তরিকতাই না ফুটে উঠলো।

এমনি আন্তরিকতা বুঝি ছুটির দিনেই সম্ভব। নিনা, ডুসিয়া, পেতিয়া আর আন্দ্রে; তিনজনেই যেন বহু পুরাণো বন্ধু। শুনলাম, ওরা ওদের স্বাস্থ্য-নিবাস থেকে একঘেয়ে রুটিনের জ্বালায় অস্থির হয়ে চলে এসেছে। আর একজন সঙ্গীর কথা বলিনি। তার নাম ইয়াগা, সে মোটরেই বসেছিল। তারা আমাদের বোটে করে বেড়াতে নিয়ে যেতে এসেছে। সিমিয়েজ-এর এক জেলের কাছ থেকে ভাড়া করেছে বোট।

হাঁ, পরিকল্পনাও ঠিক। প্রথম যাওয়া হবে বালাক্লাভা উপসাগরে। সেখানে নেমে বালাক্লাভায় বেড়াব, টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ দেখব, সমুদ্রে সাঁতরে সন্ধ্যে হলে আবার ফিরে আসব। আমি তক্ষুনি রাজি, কিন্তু ডুসিয়া নারাজ।

না, আমরা যাব না, ডুসিয়া আমাদের স্বাস্থ্য-নিবাসের সবুজ ছাদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল। অসম্ভব। অন্যসময় হবে'খন।

অন্য সময়? কেমন করে হবে বল? তোমরা তো ক'দিনের ভিতরেই চলে যাচ্ছ—তাই না? আন্দ্রে বলল, আমার দিকে তার চোখ, অনুনয় তার দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে। যেন বলছে, তোমার বন্ধুটিকে রাজি করাও।

আমি চেষ্টা করলাম।

না, না, ডুসিয়া বলল, তা হয় না, ঐ বাজে মোটরটা শেষে পথে আটকে যাক্।

না, আটকাবে না, তোমাকে কথা দিচ্ছি, পেতিয়া চিৎকার করে উঠল।

বন্ধুটিকে রাজি করাও, আন্দ্রে ফিস্ ফিস্ করে বলল।

ও যাবে, ঘাবড়াচ্ছ কেন? ফিস্ ফিস্ করে উত্তর দিলাম। ও শুধু ভাণ করছে।

ঠিকই জানতাম, যাওয়ার জন্য ডুসিয়া উৎসুক। আমরা পোশাক

পরবার জন্য পারে চললাম। ডুসিয়া আগেই নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু পেতিয়া তাকে ধরে রাখল। আন্দ্রেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে পারে গিয়ে আমাদের পোশাক যাতে না ভেজে তার জন্য মাথার উপরে তুলে নিয়ে এল। ইয়াসা, এবার চালাও, পেতিয়া চিৎকার করে উঠলো।

মোটর বোট শব্দ করে উঠল, পেট্রলের কটু গন্ধ ছড়িয়ে চলতে শুরু করল। ঢেউ উঠছে, দুলছি আমরা।

আরে কি সর্বনাশ, উলটে ফেলে দেবে নাকি? ডুসিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

এমনি সময় পাহাড়ের উপর থেকে এল পেটা ঘণ্টার শব্দ, দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে।

দেখ দেখি, ডুসিয়া হতাশ হয়ে বলল, দুপুরে খাওয়া হোল না, রাতে হবে কিনা কে জানে। তোমাদের জন্যই তো এমনি হোল। তোমরা আমাকে পাগল করে তুললে!

ভয় কি! বালাক্লাভায় গিয়ে আমরা তোমাদের এমন চমৎকার মাছ খাওয়াব, ঠোঁট চাটতে হবে দেখো! আন্দ্রে বলল, সে তার হাত ঘসছে।

তোমাদের মাছ আমি চাইনা, ডুসিয়া বিরক্ত হয়ে বলল।

তুমি যদি বল, না হয় ফিরেই যাচ্ছি, পেতিয়া দুষ্টুমি করে বলল।

না, না, ডুসিয়া বাধা দিল, এরই মধ্যে দুপুরের খাওয়ার সময় তো হয়েই গেছে। তার মুখ চোখে এবার হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল, সে হতাশার ভাম করে বলল, যখন যাচ্ছি, চল!

আমরা সবাই হেসে উঠলাম অকারণে।

[দশ]

বালাক্লাভায় এই অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ সফল হলো।

প্রথম আমাদের সম্পর্ক ছিল কেমন ছাড়া-ছাড়া—আলাপ তো মাত্র দু'দণ্ডের, কি করে ঘনিষ্টতা হবে। পেতিয়া শীগ্‌গীরই বুঝতে পারল আমার সঙ্গে প্রেম করতে যাওয়া বৃথা। সে এবার ডুসিয়ার দিকে মন দিল, দু'জনে শুরু হলো ভীষণ প্রেমের দ্বন্দ্ব, কথার ফুলঝুরি ঝরল। কখনো সে ডুসিয়াকে ঠাট্টা করে, কখনো বা খোঁচা মেরে কথা কয়, কখনো জানায় প্রেম সম্ভাষণ, কখনো-বা এক কলি গান গেয়ে ওঠে। আহা বেচারী, একবারও তার সন্দেহ হয় নি যে, ডুসিয়া অন্যের বাগদত্তা, আর ডুসিয়াও কৌশলে সে কথা এড়িয়ে গেল যে মস্কোতে সে একজনকে ফেলে এসেছে, যে তার জন্য পাগল। সে পেতিয়ার আক্রমণ এড়িয়ে চলল, কিন্তু এমন কৌশলে যাতে সে এমন একজন সহানুভূতিশীল এবং বুদ্ধিমান প্রেমিককে না হারায়। ডুসিয়া বুঝতে পারল, আমি তার এই খেলা দেখছি, তাই সে মাঝে চোখ টিপে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল। আমরা মুখ টিপে টিপে দু'জনেই খুব হাসছিলাম, যদিও এমন হাসির কিছু ছিল না।

বোটের গোলুইতে বসে ছিল আন্দ্রে, আমার কাঁধে যাতে কাঁধ না ঠেকে, তাই সে সতর্ক হয়ে সরে বসেছিল। সে ছিল মার্জিত-রুচির মানুষ। আমরা বসে বসে দেখছিলাম নীল জল।

আমাদের দলের পঞ্চম সভ্য ইয়াসা, ওকে আমরা ঠাট্টা করে নাম দিলাম যন্ত্রের কাজে উৎসর্গীত আত্মা। সত্যিই তাই, ও ইঞ্জিন নিয়েই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন খারাপ হচ্ছে আর ওর হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, শয়তানে নিক!

এদিকে প্রতি মুহূর্তে আমার মন যেন আরো চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

বুঝি সমুদ্রের হাওয়া এমনি মানুষকে উতলা করে তোলে।

বালাক্লাভায় আমরা এক ছায়াঘন রেস্তর াঁয় বসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা মাছ পেলাম না বটে, তবে 'সুলতাগকা' খেলাম, একজন বর্ষিয়সী গ্রীক স্ত্রীলোক এক বিরাট পাত্র এনে হাজির করল। এই গোলাপী মাছগুলো এক এক থোকায় পাঁচটা করে বাঁধা। ওলিভ তেল দিয়ে মচ্‌মচে করে ভেজে আনা হোল, আমরা চিবুতেই গুঁড়িয়ে গেল আমাদের মুখে। তেলের গন্ধটা যদিও বাতির তেলের মতো, তবু অমন মাছ ভাজা কখনো খাইনি। তারপরে নিয়ে এল ডিমের প্লাণ্ট, গ্রীক ধরণে তৈরি, জলপাই আর ভেড়ার দুধের পনীর।

আমরা একটু মদও খেলাম। পেতিয়া, আন্দ্রে আর ইয়াসা ঘোলাটে সাদা মদ খেল মাটির পাত্রে, ডুসিয়া আর আমার ও-মদ পছন্দ হোল না। আমাদের জন্ত আনা হোল গোলাপী মুস্কাটেল। আমরা আনন্দে পান করলাম। এখনো সূর্য আকাশে, রেস্তর াঁর ছোট্ট উঠোনের বালিতে টুকরো টুকরো সোনালী ছায়া। মুস্কাটেলের কালো বোতলের উপরে উড়ছে বোলতা। সবুজ টবে টবে করবী গাছে গোলাপী ফুল ফুটে আছে, কেমন একটি মদির গন্ধ। উঠোনে একটি পুরোনো নোঙর আর জেলেদের জালের কাঠি পড়ে আছে।

আবার বুকে কামনার শিখা জ্বলছে।

খাওয়া সেরে আমরা এক খাড়া পাহাড়ে গিয়ে উঠলাম। এইখানেই টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ। কখনো কখনো আন্দ্রে আগে যাচ্ছিল, আমাকে হাত ধরে কাছে নিয়ে আসছিল, কখনো-বা আমি যাচ্ছিলাম আগে আগে। টাওয়ারের ভাঙা ফাটল দিয়ে আসছিল সমুদ্রের হাওয়া। আমি টাওয়ারের একেবারে উপরে গিয়ে উঠলাম। সবার থেকে তখন

আমি উঁচুতে, নিশানের মতোই যেন দুলছি।

আমার নিচে বালাক্লাভা উপসাগর ছাপানো মানচিত্রের মতো বিছিয়ে আছে। উপসাগরের মাঝখানে একখানা পুরনো জাহাজ ফেলেছে নোঙর, পাল তার তোলা। ভারি ছোট দেখাচ্ছিল। এই জাহাজখানা ভাড়া নিয়েছে এক চলচ্চিত্র কোম্পানী। তারা এখানে 'ক্যাপটেইন গ্রাণ্টের ছেলেমেয়েরা' এই ছবিখানির কয়েকটা দৃশ্য তুলছে। খাওয়ার আগে আমরা বন্দরে একজন লম্বা লোক দেখেছিলাম, তার কাঁধে একটা দূরবীন ঝোলানো। শুনলাম, সেইই নাকি অভিনেতা চারকাসভ।

পাঁচটা টর্পেডো-শিকারী নৌকো; তারপর দু'টো, তারপর একটা জল কেটে চলে গেল, ভীষণ ফেনা উঠছে।

সমস্ত-কিছু খুঁটিনাটি এক অনুভূতি হয়ে মিশে গেল, সে সুখের অনুভূতি, তারই জন্য এল ভাবনা। বাড়ি ফিরলাম চাঁদের আলোয়, তখন রাত হয়ে গেছে। যখন বিদায় নিচ্ছিলাম, আন্দ্রে আমার হাতখানা তার দু'হাতে চেপে ধরে রাখল খানিকক্ষণ। আমাকে ছেড়ে দিতে সে যেন চায় না। তারপর কোমল বিষাদ-মাখা স্বরে বলল, এখন কি হবে নিনচ্‌কা?

জানি না তো! ফিস ফিস করে বললাম। ডুসিয়া আর আমি যখন অতিথিশালার সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, তখন মোটর বোটের ছায়া দেখতে পেলাম। জ্যোৎস্না-ভরা সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে বোট।

পাহাড়ের উপরের গাছপালা রূপোলী হয়ে গেছে। পুরনো মঠের ঘণ্টা পেটার টাওয়ার ছায়াময় নীলে ঢাকা, তারই বহু নিচে জঙ্গলে শ্বেত পাথরের ভাঙা স্তূপ। লোকে বলে এক সময়ে সেখানে ছিল ডায়েনার মন্দির।

দূরে পাহাড়ে শান্ত্রীর কালো মূর্তি। ওখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে উপকূলবর্তী প্রহরীর দল। কিন্তু এখন পৃথিবীতে ওসব আছে বলে তো

মনে হচ্ছে না।

সব-কিছু যেন যাদু-ছোঁয়া।

আমরা তখনই শুয়ে পড়লাম না। একটা লম্বা বেঞ্চে বসে রইলাম। স্বাস্থ্যনিবাসের আরো কয়েকজনও সেখানে ছিল। বসে বসে গান গাইলাম আমরা, এমনি গানই বুঝি গাইবার ক্ষণ তখন। 'দ্বীপ ছাড়িয়ে, হাওয়া বইছে, আমাদের খুদে বাক্স ভর্তি'—এমনি গান। চলে যাবার আগে আন্দ্রের সঙ্গে তারপরে বহুবার দেখা হোল। দু-তিনবার পেতিয়াকে না নিয়েই সে এল। আমরা তখন বেড়াতে যেতাম দুজনে, কখনো-বা বারান্দায় বসে বসে সমুদ্র দেখতাম, এই সময়টুকুর ভিতরেই আন্দ্রেকে আমি চিনলাম, তার প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল। তার চরিত্র সৎ, সোজা লোক সে, তা ছাড়া আছে দৃঢ়তা, আমাকে সে ভাল বেসেছে, সে ভালবাসার উপর নির্ভর করা যায়।

কেন জানিনা, আমি নিঃসন্দেহ হলাম। তার ভালবাসা সত্যিকারের বলেই মনে হোল। এ ক্ষেত্রে আমরা মেয়েরা প্রায়ই ভুল করি না। আমিও তাকে ভালবাসলাম, ডুবে গেলাম ভালবাসায়। মন যেন গান গেয়ে উঠলো, আনন্দ আব গবে ভ'রে গেল। কিন্তু দু'জনে তখনো ভালবাসার একটা কথাও বলিনি। সে তো জানাই ছিল।

তখনো আমার আর ডুসিয়ার ছুটি ফুরোবার ক'দিন বাকি। আন্দ্রে যদিও মুখ ফুটে কিছু বলেনি, তবুও নিশ্চিত জানতাম, একদিন আবার দেখা হবেই, কিন্তু সে তো এল না।

আমাদের গাড়ি ছাড়বে দুপুর রাতে। ডুসিয়া আর আমি সেবাস্তপুলে এসে পৌছলাম রাত ন'টায়। গাড়ি থেকে নেমে ষ্টেশনের কাছে যাকে প্রথম দেখলাম, সে আন্দ্রে। আমি তাকে সেখানে দেখে অবাক হইনি, কিন্তু আমার হাতখানা হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ডুসিয়াও অবাক

হোল না দেখলাম। যা হওয়া উচিত, তাই তো হয়েছে, কিন্তু বুকের ভিতরটায় তোলপাড় শুরু হোল, মুখ লাল হয়ে গেল। রক্তের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল কানে, গালে, চুলের মূল পর্যন্ত শিউরে উঠল। এমন বিভ্রান্ত হলাম, কি বলবো। একটা কথা বেরুল না, চোখ দিয়ে ঝরল জল। তখন বুঝতে পারলাম, কি আবেগ নিয়ে এ-ক'টা দিন কাটিয়েছি।

সে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি সলজ্জ ভঙ্গি, চোখে গাম্ভীর্য, যেন জিজ্ঞেস করছে: এখন কি হবে নিনচ্‌কা?

আন্দ্রের সাহায্য নিয়ে আমাদের জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করলাম। সে এবার প্রস্তাব করল, এখনো সেবাস্তপুলে বেড়াবার সময় আছে। বুলেভারে গিয়ে ক'টা আইসক্রীম খাওয়ার কথাও বলল। ডুসিয়া জানালো সে ক্লান্ত। সে এল না।

নিনচ্‌কা, তুমি যাও, কিন্তু দেরি কোরো না।

আমার তাকে সাধবার ইচ্ছে ছিল না। নিজে ভাববারও সময় পেলাম না। আমি আন্দ্রের হাত ধরে অপরাধীর মতো তাকালাম ডুসিয়ার দিকে। ডুসিয়া হাসল।

যাও, আমি ওয়েটিং রুমে আছি।

তারপর সে এক স্বপ্ন। হাঁ, আমরা দেরি করেই ফিরলাম।

[এগারো]

তারপর তিন বছর কেটে গেছে? এই ক'টা বছর কি জীবনের খুব বেশি, না কম? সবই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। আমার জীবনে এল চরম দুঃখ এই তিন বছরের ভিতরে! আন্দ্রে আর নেই। আমার সুখ, আমার প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে গেল, আমি একা। আমি নিঃসঙ্গতার সঙ্গে

যুদ্ধ করলাম কাজে ডুবে থেকে। বেশির ভাগ সময়ই কাটাতাম কারখানায়।

একচল্লিশ সালের শরৎকালে কি ঘটেছিল আপনার মনে আছে? তখন বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি আসছিল। ষ্টেশনে মাল খালাস করে দিলেই সেগুলি নিয়ে আসতে হোত। বৃষ্টি আর বরফের ভয়ে একদিনও ফেলে রাখার উপায় ছিল না। তখন তখনই কারখানায় নিয়ে গিয়ে তুলতে হোত।

তখন বিলম্ব মানেই মৃত্যু। শান্তির সময়ে আমাদের মতো কারখানা তৈরি করতে পাঁচ ছ' মাস লাগত, কিন্তু ক'দিনেই আমাদের কারখানা তৈরি করে নিতে হোল। মেসিন আসতেই বসিয়ে দেওয়া হোল। আগেই খসড়া করে রেখেছিলাম। এক মুহূর্ত তখন নষ্ট করবার উপায় নেই।

এদিকে ট্রাকের ভয়ানক অভাব। কতগুলো মেসিন লোক দিয়ে ঠেলে নিয়ে আসতে হোল। আমরা বোলারে জুড়ে কাদার ভিতর দিয়ে টেনে আনলাম মেসিন। খুব ধকল গেল শরীরে। দড়িতে কেটে গেল হাত আর পিঠ। তখনো কারখানায় উত্তাপের বন্দোবস্ত হয়নি, তবু শুরু হোল কাজ। আপনি কি বুঝতে পারছেন কি অসম্ভব শক্তি আর উৎসাহ লেগেছিল কাজ করতে? রুশ শ্রমিকেরা তখন যে কাজ করেছে, শুধু সাহসী বীরদের দ্বারাই তা সম্ভব।

সেবার শীত কত তাড়াতাড়ি এল নিশ্চয়ই মনে আছে। শুকনো পাতা তখনো গাছ থেকে ঝরে পড়েনি, এমনকি যেমন হলদে হওয়ার কথা তা-ও হয়নি। খুব বরফ পড়া শুরু হোল। বরফের ভারে চারা মেপল গাছগুলো ভেঙে পড়লো। ভলগার ওপার থেকে কয়েক সপ্তাহ ধরে বরফের ঝড় বইল। ভলগা তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, বন্ধুত্ব আর নেই। আকাশও আঁধার, ঝুলে আছে কর্দমাক্ত শহরের উপর। রাতদিন শুধু শুনছি জাহাজের বাঁশি, সেও যেন গম্ভীর। বিমান হানার

সংকেতধ্বনির মতোই কানে এসে বাজছে।

এত তাড়াতাড়ি তিরিশ ডিগ্রী নেমে এল তাপমানযন্ত্রের কাঁটা। ভোলগা জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে। কারখানার জলের নলগুলো ফাটছে, জল গড়াচ্ছে ছাদ চুইয়ে, বরফ জমে উঠছে। দেয়াল, জানালা, সব-কিছু বরফে ঢাকা। হাত পযন্ত বেয়ারিং মেসিনের ভিতর আটকে যাচ্ছে। বাইরে নিয়ে এলে দেখা যায়, খানিকটা চামড়া উঠে গেছে। এমনি অবস্থায় মানুষের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। তবুও কাজ চালালাম। আমরা কারখানার ভিতরে আগুনের কুণ্ড জ্বালালাম। আমাদের বরফের গুহার ভিতরে আগুন জ্বালাতে লাগলাম।

কি সে সময়! এখন মনে করতেও ভয় হয়। ইউক্রাইন অধিকৃত, হোয়াইট রাশিয়া অধিকৃত. লেনিনগ্রাদ শত্রু-পরিবৃত, গোলোকোলোমাস্ক আর ইস্ত্রা তাদেব দখলে। একবার ভেবে দেখুন—ইস্ত্রা পযন্ত! খবর এসেছে জার্মান ট্যাঙ্ক এসে পৌঁচেছে খিমকীতে।

দিন ক্রমাগতই ছোট হয়ে যাচ্ছে। ভোব থেকেই যেন গোধূলি শুরু হয়। হাওয়া টেলিফোনের তাবের উপব দিয়ে শিস দিতে দিতে গোঙাতে গোঙাতে চলেছে। জেলার বেতার কেন্দ্রেব এরিয়েলের উপর নীল আলো ঝলসাচ্ছে। সমস্ত দিন ধরে, লাউড-স্পীকাব থেকে স্থানীয় একঘেয়ে সংবাদ ঝরে পড়ছে। এই থেমে যায়, আবার মুহূর্তের বিরতির পরেই শুরু। একঘেয়ে আর অবিরাম গতিতে চলে, হঠাৎ খুট করে শব্দ, এবার গভীর স্বরে বেজে ওঠে: নিয়তির সে স্বর: মস্কোর সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরো থেকে সংবাদ বলছি: শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে আমরা এই শহর ছেড়ে যাচ্ছি……

নিচু আকাশ আরো যেন নিচু হয়ে এল। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার কারখানার এই দুর্দিনে যে রকম কাজ হোল মস্কোতে যুদ্ধের আগেও

এত হয়নি। শ্রমিকরা জায়গা ছেড়ে দিনে রাতে একবারও ওঠেনি। তারা তখনো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না, তবু কেউ তাঁদের ঘুমোতে যেতে বাধ্য করতে পারে নি। হাঁ……আমি আপনাকে তো অন্য কথাই বলছিলাম……

আমার বৈধব্যের প্রথম দিনের কথা। কারখানায় অন্যান্য দিনের মতোই সেদিন। জীবন আমার দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন, আমাকে সে টেনে নিয়ে চলল চাকায় বেঁধে।

মিঙ্কের সঙ্গে কথা বলে আমার ছোট্ট আফিসটিতে ফিরে এলাম। এটি কারখানার ভিতরে, প্লাইউডের পার্টিশান দিয়ে তৈরি। আফিসে একটা দেরাজ, একটা ভাঁজ-করা যায় এমনি খাট, তাতে আমি কখনো কখনো ঘুমোই। আমি এবাব বল বেয়ারিং-এর ইমালসন নিয়ে পড়লাম। মিঙ্ক ঠিকই বলেছে। বহুদিন থেকেই আমি জানতাম, আমি কি করব ভেবেও ছিলাম, কিন্তু কিছু করতে পারি নি। এবার ঠিক করলাম, কাজে নামতে হবে। আমি কাবখানার পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা করলাম। কিছুক্ষণ পরেই বার করে ফেললাম কি করতে হবে, একটা প্ল্যান আঁকলাম।

এমন ডুবে গেলাম আঁকায়, আমার দুঃখই শুধু ভুললাম না, সময়েব জ্ঞানও রইল না। যখন কাজ করেছিলাম, আমার অবচেতন মনে যুদ্ধের চিন্তা, আন্দ্রের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। বহুদিন তার চিঠি পাইনি। এত কম চিঠি লেখে বলে ওর উপর রাগ হোল। ও যদি জানত, আমার অবচেতন মনে কতখানি দুশ্চিন্তা ওর জন্য লুকিয়ে আছে, ওকে আমি কত ভালবাসি, ও নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে অন্তত দু-এক ছত্র লিখবার সময় পেত কিন্তু এ তো বড় কথা নয়! আমি শুধু চাইতাম, ওর কিছু বিপদ না ঘটে—হাঁ, এই আমার কামনা।

হঠাৎ কিন্তু অবচেতন মনের চিন্তা বিজলী ঝলকের মতো চেতনায় খেলে

গেল। হা ভগবান, কি করে আমি ভুলে গেলাম! পরমুহূর্তে অবসন্নতা এল। পড়ে গেল হাতের পেন্সিলটা, এক নতুন হতাশা এসে জুড়ে বসল মনে। আমি চিৎকার করেই উঠতাম, কিন্তু এমন সময় প্লাইউডের দরজাটা শব্দ করে উঠল। ঘরে ঢুকল ভলকভ, সে পেন্সন নিয়েছিল, আবার নিজের ইচ্ছেয় কাজে এসেছে। ভারি খিটখিটে মেজাজের লোক। বলতে কি ওকে আমার একটুও পছন্দ হয় না। মস্ত বড় নাক, মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা কাঁচা দাড়ি, গাল তার তোবড়ানো। সব সময়ই তার গায়ে সস্তা তামাক আর লোহার গন্ধ, কখনো কখনো ভদ্‌কার গন্ধও পাওয়া যায়।

ঠিক তেমনি, আমার দিকে না তাকিয়েই সে বসে পড়ল, তার হাত রেখেছে ছেঁড়া পাৎলুনের উপর, মেঝেয় থুথু ফেলে জুতোর তলা দিয়ে মুছে ফেলল। তারপর একটু থেমে বলল—

না, এমনি করে কাজ চলবেনা, আশাও করো না।

তারপর সোজা তাকাল আমার মুখের দিকে। ছাগলের চোখের মতো তার চোখ। তার ঠোঁট সে চেপে আছে, আঙুল দিয়ে হাটু চাপড়াচ্ছে, এমন তার ভাবভঙ্গি, মনে হোল, সে আর কিছু বল্‌বে না।

সে কি রকম একগুঁয়ে আর বদ্‌রাগী লোক আমি জানতাম। মনে হোত, সব সময়েই ও আমার খুঁত ধরতে চায়। আমার অল্প বয়েস আর ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যাকে সে যেন বিদ্রূপের চোখেই দেখে, আমি যেন কারখানায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছি এমনি তার ভাবখানা। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় সম্মানিতা কুমারী বা প্রধান কমরেড এমনি করেই সম্বোধন করে। তার ছাগল চোখে যেন বলে, তুমি কারখানার প্রধান, দেখি, তুমি এবার আমাকে কি হুকুম কর!

সে একজন নামী শ্রমিক। তাকে আমি সম্মানও করতাম, কিন্তু দূরে

দূরে থাকতাম, যাতে সে আমার হুকুম না অমান্য করে। আমি জানতাম, কারখানার প্রধান আমি, সে নয়, এখানকার দায়িত্বও আমার। আমার পদের মূল্য আছে, আছে মর্যাদা, শ্রমিকদের কাছে সম্মান হারাবার ভয় হোত সব সময়।

সে ভারি একগুঁয়ে ছিল, আমিও তেমনি। সে চুপ করে রইল। আমি এমনি ভাণ করলাম যেন কাজে ব্যস্ত হয়ে তার কথা ভুলেই গেছি। বহুক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু তার মুখে কথাটি নেই। ভারি বিরক্ত হলাম, বিরক্তি এবার বেড়ে গেল, কিন্তু সে তখনো চুপচাপ।

বল, কি বলবে ? আমি উদাসীনতার ভাণ করে বললাম, আমি শুনছি।

দেখুন, কিছুই হচ্ছে না। সে আবার বলল, তখনো আঙুল দিয়ে হাঁটু চাপড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা কি খুলে বল, আমি কঠিন স্বরে বললাম।

প্রধান, ব্যাপারটা খুবই সামান্য, ভলকভ কথাটা বলে আবার চুপ করে গেল।

আমি ব্যস্ত, বললাম।

আমরা সবাই তো এখানে ব্যস্ত, সে উত্তর দিল।

না, তোমাকে দেখে তো ব্যস্ত বলে মনে হয় না। এখন কাজের সময় অথচ এখানে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ। কি ব্যাপার বল, না-হয় চলে যাও। তাছাড়া হুকুম না নিয়েই তুমি কাজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসেছ।

আমি ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম, সে কিন্তু তখনো শান্ত।

ব্যাপারটা কি খুবই সোজা, সে বলল, যন্ত্রপাতির অংশগুলো পেলে আমি সব ঠিক করে নিতাম। কিন্তু সেগুলো তো পাচ্ছি না। আমার তো দোষ নয়। কাজ না করে মুফোত তো আমি রুজি-রোজগার করি না। আমার

উপর খেঁকিয়ে না উঠে, তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতির টুকরোগুলো পাঠাতে বলুন। না হলে কোনো কাজই হবে না, আমি পেন্সন নিয়েছিলাম, কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি বসে পেন্সন খাব।

সে কি, ওরা তোমাকে এখনো সব ঠিক করে দেয় নি! কেন দেয় নি?

সে আপনার ব্যাপার আপনিই জানেন। আপনি ইঞ্জিনিয়ার। আমার কাজ, সময় মতো সব পাচ্ছি না একথা জানানো। জানিয়ে গেলাম, এখন আপনি যা হয় করবেন।

সে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এক মিনিট দাঁড়াও, চিৎকার করে উঠলাম।

আমার কাজ, আপনাকে জানানো, সে আবার বলল, আপনি যন্ত্রপাতি ঠিক করে দিয়েছেন, চমৎকার হয়েছে!

সে থুথু ফেলে প্লাইউডের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দেখ, এমন উদ্ধতভাবে কথা বোলো না, আমি রাগ চেপে রেখে বললাম, যদিও স্বরে তখন রাগের ঝাঁঝ বেশ স্পষ্ট হয়েই উঠেছিল।

আমি তখন উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, কিন্তু মনে মনে জানতাম, ও ঠিকই বলেছে। বেয়ারিং মেসিনগুলো এখনো ঠিকভাবে বসানো হয়নি। অংশগুলো আনতে বহু সময় নষ্ট হয়েছে। একেতো গুদামগুলো বহু দূরে, তাছাড়া, আমাদের ট্রলি বা ঠেলা-গাড়িও নেই। বড় বড় বাক্সে যন্ত্রপাতির অংশগুলো বোঝাই করে বয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে মানুষ দিয়ে। কিন্তু তাতে সময় আর শ্রম দুই-ই অযথা ব্যয় হচ্ছে।

[বারো]

হাঁ, অনেকদিন আগেই বেয়ারিং মেসিনগুলো ঠিক করা উচিত ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। এবার তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার।

আমি যে বিভাগের ওপর সবকিছু তৈরি করবার ভার, সেখানে গেলাম। আমার পরিকল্পনা ওরা গ্রহণ করলেন, তারপর গেলাম প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে। একটা গোটা দিন চলে গেল, আমার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করবার অনুমতি পেলাম। কেমন করে কাটল একটা দিন জানিনা, আমার বিধবা জীবনের একটি দিন কেটে গেল।

সেদিনের একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অদ্ভুত কিন্তু, আমার দুঃখের অনুভূতি সে নয়, যাকে চিরবিদায় দিয়েছি সে আন্দ্রের চিন্তাও নয়। বেয়ারিং বিভাগ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম এক চমৎকার দৃশ্য। প্রথম পালা কাজ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় পালা এবার। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে মুশিয়াকে। খুদে মেয়েটি তার বেঞ্চ একখানা ঝাড়ন দিয়ে মুছে, ঝাড়নটা দেয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রাখল, হাতে মুছে নিল পোশাকে। এলোচুলের গোছা বেঁধে খোঁপা করল, তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে চলে গেল জোসিয়ার বেঞ্চের কাছে। সেখান থেকে খুদে লাল নিশানটি তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় এনে একটা পিন দিয়ে আটকে রাখল।

জোসিয়া ভিড়ের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তার উদাসীন ভঙ্গি, বোকা হাসি তার মুখে, চাপতে চেষ্টা করছে, পারছে না; তার কালো চোখে ঈর্ষার আগুন। মুশিয়া ভাল করে দেখে নিল নিশানটা ঠিক আটকেছে কিনা, তারপর সবাইকে উপেক্ষা করে দরজার কাছে চলে গেল। তার চিবুক তখনো গর্বে উন্নত। জোসিয়ার এত কাছ ঘেসে

গেল যে, তার কাঁধে প্রায় কাঁধ লাগে আর কি ! যাওয়ার সময় সে না বলে পারল না : এবার নাও দেখি নিশান !

তারপর ক্ষণিক বিজলী ঝলকের মতো জিভ্ বার করে দেখাল জোসিয়াকে।

জোসিয়া এই অপমানে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে জুতোর গোড়ালি দিয়ে চেপ্টে দিল। এবার আমাকে দেখতে পেয়ে সে নিজেকে সংযত করল।

এমনি ব্যাপার কখনো দেখেছেন ? সে রেগে বলল।

আমি তো তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

আচ্ছা, কাল দেখা যাবে, সে বিড় বিড় করে বলল।

আমরাও সেই আশায় আছি।

হাঁ, বাজি রাখতে পারি, কাল দেখবেন আপনারা—জোসিয়া বলল।

দেরি করে প্রায় রাত এগারটায় বাড়ি ফিরে এক পেয়ালা দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আন্দ্রেকে ফিরে পেতে চাইলাম আমার মনে, কিন্তু গা'টা গরম হতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। অনুভূতি গেল মিলিয়ে, এমন কি স্বপ্নেও সে এল না।

এমনি অদ্ভুতভাবে কাটালাম কয়েকদিন—এক সপ্তাহই হয়তো হবে। আমার নতুন জীবন শুরু হোল বটে, কিন্তু নতুন বা বিশেষ কিছু তো ঘটল না, অবাক হলাম। সব-কিছুই আগের মতো চলছে। হাঁ, আগেরই মতো, যেন আমার উপর ঈর্ষা করেই এক চুলও বদলায়নি ! কাউকে জানালাম না আন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ। হয় তো, মনের গভীরে তখনো আশা, সে বেঁচে আছে, তার মৃত্যুসংবাদ হয়তো ভুল।

আন্দ্রের মৃত্যু আমার জীবন থেকে একেবারে আলাদা, দু'টোর ভিতরে কোনো যোগসূত্র নেই, মাঝে মাঝে একথা মনে হতে কষ্ট হোত,

কিন্তু বেশি সময়ই কাজের চাপে পড়ে সব ভুলে যেতাম। তখন আমরা আবার যন্ত্রপাতি ঠিক করে বসাতে শুরু করেছি।

সেদিন রাতে সদর দরজা বন্ধ করছি ঘরের, এমন সময় বাড়িউলী এসে বলল, তোমার একখানা চিঠি এসেছে।

সে আমার হাতে দিল সেই চৌকো খাম, আন্দ্রেরই হাতে লেখা ঠিকানা উপরে—না কোনো ভুল নেই। চারদিকে যেন অন্ধকার দেখলাম। দরজার হাতলটা চেপে ধরলাম তাড়াতাড়ি। একটা উন্মত্ত আশায় উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

দৌড়ে ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। চিঠিখানাই তখন শুধু চেতনায় আছে, আর সব মুছে গেছে। খাম ছিঁড়তে গিয়ে আঙুল কাঁপছিল। প্রিয় নিনা, আমাকে ক্ষমা কোরো প্রিয়া, বহুদিন তোমার কাছে চিঠি লিখতে পারিনি বলে ক্ষমা কোরো। পড়লাম পরিচিত কথা, পরিচিত হাতের অক্ষর…তেমনি স্পষ্ট, তেমনি প্রিয়।

বেশি দূর এগোতে পারলাম না। তারিখটা দেখলাম। সে সবসময়ে চিঠির ওপরে তারিখ দিত। পড়লাম, এক বনের ভিতরে বসে লেখা, ৮ই মার্চ, ১৯৪২ সাল। এবার সরকারী বিজ্ঞপ্তিখানা বার করলাম। অবিশ্বাস্য এক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন তখন সেই বিজ্ঞপ্তিখানার ভাঁজ খুলে পড়তে। খুললাম, পড়লামও : বীরের মতো যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে সে ন' তারিখে। বৃথা আশা! সব-কিছু স্পষ্ট, নিষ্ঠুরভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিঠি আগের দিন লেখা, বিজ্ঞপ্তি তার পরে। এই তার শেষ চিঠি। আর সে চিঠি লিখবে না। হাঁ, তা আমি জানি।

কিছুক্ষণ বসে রইলাম স্তব্ধ হয়ে, ঘরের কোণে দৃষ্টি, তারপর পড়লাম চিঠি, শান্তভাবেই পড়লাম। খুব বড় নয়, বিশেষ-কিছু লেখেনি। কিন্তু আন্দ্রে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে বলেই তার চিঠির প্রতিটি ছত্র এক

বিশেষ অর্থ নিয়ে দেখা দিল আমার কাছে, এক রহস্যময়তা নিয়ে এল।

সব-কিছুই তেমনি (আন্দ্রে লিখেছে), সীমান্ত এখন বেশ নিঝুম, তেমন কিছুই ঘটছে না। কিন্তু কথায় বলেনা, আজ ঠাণ্ডা, কাল গরম… …সব তো আর একরকম চলতে পারে না। আমরা চুপ করে বসে নেই। ফাসিস্ত গুণ্ডাদের সোভিয়েটের আকাশ থেকে তাড়াবার বন্দোবস্ত করছি। জলবায়ুর অবস্থা এখন ভালো, এখনো ঠাণ্ডা আছে, তবে বসন্তের আমেজ বাতাসে।

দিনে সূর্য বেশ আলো দিচ্ছে, আমাদের বরফে-মোড়া পথঘাট গলতে শুরু করেছে, এখানে-ওখানে দেখা দিচ্ছে ফাটল। এখনো স্প্যারো পাখীরা আসেনি, কিন্তু শীতের দিনের পাখীদের কলরব শুরু হয়েছে ঝোপে ঝাড়ে। আজ ৮ই মার্চ—নারী দিবস। এই জন্যে ডিনারের সময় তিন ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে, কারণ আমাদের সমর-বিভাগের দেবীর দল ডিনার হল ছেড়ে পার্টিতে গেছেন। কিন্তু আমরা তাতে একটুও অসন্তুষ্ট হইনি। তারা একটু আনন্দ করুন না, এতো তাদেরই দিন।

ছুটির দিন বলে আমরা ডিনারের সময় আমাদের অনুপস্থিত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপান করলাম। তোমার উদ্দেশ্যে পান করলাম আমি, মনে মনে চুমু খেলাম তোমার হাতে, তুমি তো আমাকে দিয়েছ প্রেম, সুখী করেছ। আমার ভলগার পারে তোমার জীবন কাটছে কেমন? আমার প্রিয় যুদ্ধে বীরাঙ্গনা, তুমি হাঁপিয়ে ওঠনি তো। চিন্তা কি প্রিয়া। পৃথিবীর সব-কিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে, আমাদের বিচ্ছেদও একদিন শেষ হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আবার আমরা পরস্পরের দেখা পাব, আগের চাইতে জীবন হবে আরো আনন্দময়। কিন্তু এখন ভগ্নোৎসাহ হলে চলবে না, এখন শত্রুর কেশর আর লেজে আঘাত হানতে হবে। তুমি কেশরে আঘাত হান, আমি হান্‌ব, লেজের দিকে; অথবা তোমার যা ইচ্ছে।

কি রাজী তো ? ও, ভালো কথা, ভুলেই গিছলাম। আমাদের এখানে সেদিন কে এসেছিল জানো ? না, তুমি ধারণাও করতে পারবে না। পেতিয়া, হাঁ, সে নিজে ! পেতিয়াকে মনে আছে তো ? ক্রাইমিয়ার সমুদ্র তীরে সেই অবিস্মরণীয় দিন ক'টা যে পেতিয়া আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছিল, তোমার বন্ধুকে যে প্রেম নিবেদন করে সফল হয় নি—সেই পেতিয়া ! চমৎকার লোক, আমার পুরনো বন্ধু, যদিও বয়েস বেশি নয়, বরং ছোকরাই বলতে হবে। আমরা অতীতের উজ্জ্বল দিনগুলো আবার জাগিয়ে তুললাম, তোমার কথাও হোল।

সে কথায় কথায় স্বীকার করল, তোমার বন্ধুটির দিকে তার নজর ছিল না, নজর ছিল তোমারই দিকে। কি পাজি দেখেছো ! সে তার সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে তোমাকে। কি সুখের সে দিনগুলি ! আমাদের সেই প্রেমের শহর সেবাস্তপুলের কথা কি তোমার মনে পড়ে ? শুনলাম, সেখানে একটা বাড়িও নাকি আস্ত নেই। সব ধ্বংসস্তূপ। তখন কি আমরা ভেবেছিলাম যে, এমনি হবে ? যাকগে দিন আমাদেরও আসবে। আমাদের পথে পথে আবার উঠবে উৎসবের কোলাহল। বিদায় আমার খুদে বন্ধু, তোমার হাতের উপর রাখলাম আমার সস্নেহ চুম্বন। তুমি সুখে আছ, ভাল আছ জানলেই হোল, আমি আর কিছু চিন্তা করি না। আমার জন্য চিন্তিত হোয়ো না। আমার কোনো বিপদই হবে না। মৃত্যু—সে তো আমার পরিকল্পনার বাইরে। আমি অমর। এমনি চিঠিখানা…

সেদিন থেকে আমার ঘনিয়ে এল এক অনুর্বর শান্তি। এ শান্তি হতাশার। আমার দৈনন্দিন জীবন চলল। একঘেয়ে কাজে ডুবে রইল দিনগুলি, আমি ডুবে রইলাম তারই ভিতরে। আমার মন আর দেহ ডুবে রইল।

নিজের ভাবনা ছেড়ে দিলাম। নিজের প্রতি আর কোনো মায়া ছিল না। কখনো কখনো মনে হোত, ব্যক্তিগত জীবন শেষ হয়ে গেছে। এক তীব্র উদাসীনতা আমাকে পেয়ে বসলো। অন্তত তখন তাইই মনে হয়েছিল। আমার আত্মার গভীরে তখনো যেন আগের সত্তার ভগ্নাবশেষ লুকিয়ে ছিল, বরফের পুরু স্তরের নিচে সে তখনো খরস্রোতা নদীর মতো বইছিল।

আগের মতোই কেউ জানলনা আমার দুঃখের কথা! আগের মতোই চুপচাপ বইলাম। বোধ হয় এই জন্যই দুঃখ এত কঠিন হয়ে বাজলো বুকে, অসম্ভব হয়ে উঠলো নিঃসঙ্গ জীবন যাপন। এই জন্যই বোধ হয় কারখানায় আমার ছোট্ট প্লাইউডে তৈরি আফিসটিতে প্রায়ই ঘুমোতে আসতাম। এখানে চারদিকে লোকজন, তাই ভালো লাগত। বাড়ির নিঃসঙ্গতা তখন অসহ্য।

[তেরো]

তারপর একদিন সবাই জানলো আমার এই নিদারুণ সংবাদ,

কেমন করে জানলো বলছি। প্রথম কাজের পালার শেষে ঝিনিয়া আন্তিনোভা আমার আফিসে ছুটে এল। খারাপ বেয়ারিংগুলো বাছাই করা তার কাজ। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে আমার ডেস্কের ওপর একমুঠো তেল চকচকে ছোট ছোট বেয়ারিং ঢেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: নিনা পেত্রভ্না, ঈশ্বরের দোহাই, একবার তাকিয়ে দেখুন। এ এক অসম্ভব ব্যাপার!

কি হয়েচে?

এ-গুলো একেবারে খারাপ।

কে এগুলো তৈরি করল ?

ভলকভ।

তুমি পাগল !

আপনি পরীক্ষা করে দেখুন।

আমি কয়ে কটা বেয়ারিং নিয়ে মাপ-যন্ত্রের কাছে ছুটে গেলাম। ঝিনিয়া ঠিকই বলেছ। বেয়ারিংগুলোতে খুঁত আছে, ব্যাস ঠিক আছে কিন্তু খাঁজগুলোর পরিসীমা একটু বেশি করে কাটা, তা প্রায় বারো মাই-ক্রোনের বেশিই হবে। নমুনা মাফিক মোটেই হয়নি। আমি তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ভলকভের কাছ থেকে আব সব কিছুই আশা করা যায়: ঔদ্ধত্য, মাতলামি, এমন কি অলসতা পর্যন্ত, কিন্তু সে যে কতগুলো বেয়ারিং নষ্ট করবে এযে একেবারে অবিশ্বাস্য ! আমি আবার নিজে তার বেয়ারিংগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম। এবার একেবারে নিশ্চিন্ত হলাম। এগুলো দিয়ে কোনো কাজই হবে না।

এ তো বড় অদ্ভুত, বললাম। খুব বেশি নষ্ট হয়েছে ? ঝিনিয়া হতাশার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল : সবগুলো, খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, তার ঠোঁট কাঁপছে।

আমাকে দেখাও, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, নিজের স্বর নিজেই চিনতে পারলাম না।

যে ঘরে বেয়ারিংগুলো ছিল সেখানে ছুটে গেলাম। একটা দস্তার ছোট্ট টেবিলের উপর এক বাক্স বেয়ারিং রয়েছে। ভলকভের চব্বিশ ঘণ্টার শ্রমের প্রতীক—প্রায় পঞ্চাশ হাজার বেয়ারিং হবে। আমি দু'মুঠো তুলে মাপ-যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। কাঁটা কাঁপছে। প্রতিটি বেয়ারিং অকেজো হয়ে গেছে।

ভয় পেলাম। মাস শেষ হতে আর চারদিন বাকি, আর এখন পঞ্চাশ হাজার বেয়ারিং নষ্ট হোল। এ দুর্ঘটনা শুধু আমাদের বিভাগের একার নয়, এযে সারা কারখানার।

বাক্সের উপর দিয়ে হুমড়ি খেতে খেতে কারখানায় এলাম। ভলকভ ঝুয়ে পড়ে বেয়ারিংগুলো ছুঁড়ে ফেলছে আঁধারের ভিতরে। তার প্রকাণ্ড হাত কাঁপছে, তার ছাগল-চোখ ঝুয়ে আছে। যেন কাঁচের চোখ দুটি।

এর মানে কি বল? আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, হাতের মুঠোয় কতগুলো নষ্ট বেয়ারিং।

সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তুমি জান কি করেছ? আমি বললাম, শান্তভাবে যথাসম্ভব বলতে চেষ্টা করলাম।

তার মুখে রা' নেই, তার হাত থেকে তখনো আঁধারে পড়ছে বেয়ারিংগুলো।

এখুনি মেসিন থামাও। চেঁচিয়ে উঠলাম। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি করতে হবে যেন বুঝতে পারেনি।

মেসিন থামাও বলছি!

তবুও কথা বলল না, জায়গা থেকে নড়ল না সে।

তুমি মদ খেয়েছ। চিৎকার করে উঠলাম। জায়গা থেকে ওঠ বলছি।

সে হুকুম পালন করল। আমি সুইচটা বন্ধ করে দিলাম, একটা রেঞ্চ নিয়ে মেসিনের ওপরের আচ্ছাদনটা খুলে দিলাম, তাড়াতাড়িতে নখে লাগল। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম, মেসিন ঠিকভাবে ফিট করা হয়নি। যে কোনো লোক দেখলেই বুঝতে পারবে যন্ত্রের ছুরিগুলো ঠিকভাবে ফিট করা হয়নি।

যে মেসিন ঠিকভাবে ফিট করা হয়নি তাতে কাজ করছ কি করে?

আমার স্বরে হতাশা ফুটে উঠল।

ভলকভ উত্তর দিল না। আমি বিরক্ত হয়ে এবার ডেকে পাঠালাম মিস্ত্রীকে।

মিস্ত্রী ভ্‌লাসভও একজন পুরোনো মজুর। সেও ভলকভের মতো পেন্সন নিয়েছিল। সে ভিড়ের সুমুখে দাঁড়িয়ে ভৎর্সনার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিল।

এ মেসিন কেন ঠিক ফিট করা হয়নি? আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

কেন, নিনা পেত্রভ্‌না, সে তো আপনিই জানেন। ভ্‌লাসভ তার হাত কচলাতে শুরু করল বিভ্রান্ত হয়ে। ভ্যাসিলি ফেদ্‌রভিচ নিজের মেসিন নিজেই ঠিক করে নেয়। অন্যে ছোঁয়া তা-ও সে চায় না। কিন্তু কেউ অভিযোগ কখনো করেনি, কারণ কাজে একটুও ভুলচুক কখনো হয়নি। ভ্যাসিলি, আজ এ তোমায় কি হোল? সে তিরস্কার করল ভলকভকে। দেখ দেখি, কি করেছ? পঞ্চাশ হাজার বেয়ারিং নষ্ট করেছ। এ সারা কারখানার পক্ষে ভয়ানক ব্যাপার। কি করে এমন কাজ করলে?

কেন ওর সঙ্গে কথা কইছ? আমি চিৎকার করে উঠলাম, ভ্‌লাসভের শান্ত স্বরে আমার রাগ আরো বেড়ে গেল। দেখছনা লোকটা পাঁড় মাতাল?

না, না, মাদাম। ভলকভের ঠোঁট দুটো মৃতের মতো সাদা। সে সৈনিকের মতো বো হুকুম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তার বিস্ফারিত চোখে চেতনার ঝলক। হয়তো সে হঠাৎ তার অসতর্কতার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। তার সেই বোকার মতো 'না, মা, মাদাম' শুনে আমার মাথায় যেন রক্ত উঠলো।

কি করেছ জানো ? আমি যত জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে উঠলাম, তবু নীচ শয়তানই শুধু এমনি কাজ করতে পারে। বুঝেছ ?

আমি দুঃখিত। ভলকভ গলা খেঁকারি দিয়ে বলল। তার সেই নির্বোধের মতো গলা খেঁকারি শুনে আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি এত জোরে চিৎকার করে উঠলাম, সারা কারখানা থেকে শোনা গেল। আমার কাছেই সে স্বর অদ্ভুত। আমার মা যখন কোনো বিষয় নিয়ে ক্ষেপে যেতেন, তখন এমনি ঝাঁঝালো স্বর শুনেছি। এই চিৎকারে আমার মনের ক্ষত থেকে ঢেউ বয়ে গেল। এতদিন যে দুঃখ লুকিয়ে রেখেছিলাম, যে ব্যথা ছিল মনের গোপনে, আজ তা হঠাৎ উন্মত্ত আবেগে শত ধারায় ঝরে পড়ল।

আমি তখন সবকিছু নিঃশেষে ঢেলে দিতে ব্যস্ত যে, কথাটা পর্যন্ত শেষ করিনি। কথা আমার মুখ দিয়ে এলোমেলো হয়ে ঝরে পড়ল। আমার চিন্তাও তখন এলোমেলো। আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

ওরা যুদ্ধ করছে। আর তুমি! তুমি কি করেছ জানো ? পঞ্চাশ হাজার বেয়ারিং নষ্ট করেছ, কারখানার ভিতরে চিৎকার করে বলতে শুরু করলাম। আমাদের দেশের যারা সেরা লোক তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে দেশের শান্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি অনুপলে, দেশের জন্য রক্তবিন্দু ঝরছে। সে রক্ত আমাদের ভাইয়ের, আমাদের স্বামীর। একটা বেয়ারিং-এর দাম তাদের কাছে কতখানি তুমি জানো ? একটা বেয়ারিং মানে একখানা এরোপ্লেন, একটা বন্দুক, একটা ট্যাঙ্ক। এখুনি তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে ! আমরা তোমাকে এখানে চাইনা ! তবে তোমাকে সহজে ছাড়া হবে না। আমি যে পর্যন্ত না—

নিনা পেত্রভ্‌না, দোহাই তোমার, থাম। শান্ত হও।

ভোরোনিৎস্কায়া আমার কাঁধে আলতো ভাবে হাত রেখে বলল, চিৎকার করো না। ওর দিকে তাকিয়ে দেখ। দেখ ও আর সে ভলকভ নেই।

সে ভলকভ নেই! আমি আবার চিৎকার করে তার হাত সরিয়ে দিলাম। আমার কথাও একবার ভাববে না? আমাতে কি আমি আছি? আমার স্বামী সীমান্তে মারা গেছেন, হঠাৎ ফেটে পড়লাম আমি। তোমরা কি বুঝতে পারছ, না, এখনো বোঝনি? হাঁ, সেরা লোকরা মরছে, সত্যিকারের বীরদের পবিত্র রক্ত···আর এখানে সীমান্তের বহু দূরে কতগুলো ঘৃণ্য কুকুর···আমি ভলকভের দিকে তাকালাম। এখানে দাঁড়িয়ে আছ? এখনো বেরিয়ে যাচ্ছনা?

বিস্মিতভাবে আস্তে আস্তে বলল ভলকভ, আপনার যখন ইচ্ছে তখন চলেই যাচ্ছি। তার ঠোঁট কাঁপছিল। কামিজ পড়তে গিয়ে বার বার হাতা দুটোর ভিতরে হাত ঢোকাতে পারছিল না, রুমালটা কোনো রকমে বেঁধে নিলে গলায়, তারপর ফারের টুপিটি হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল কারখানা থেকে। পিঠ তাব কেমন বেঁকে গেছে।

অবশ্য তাকে তাড়াবার আমার অধিকার ছিল না, তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবারও না। নিজেই তাকে শাস্তি দিলাম আমি। অন্য সময় হলে ভলকভের হয়ে কেউ না কেউ দাঁড়াত। কিন্তু আমি তখন বলে ফেলেছি, আমার স্বামী সীমান্তে নিহত হয়েছে, তারই আকস্মিকতায় তারা ভুলে গেল ভলকভের কথা। সবাই আমার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

কি দুর্ভাগ্য! জিনাইদা কনস্তান্তিনোভ্‌না বললেন, বহু দিন হয়ে গেল নাকি?

হা ভগবান, বিরক্ত হয়ে বললাম, অল্প দিন আর বহুদিনে তফাৎ কোথায়? হাঁ, মাস খানেক আগে হয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু এখন

তো তা নিয়ে কথা বলবার সময় নয়। এখন আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। একটা পাজি কাজ নষ্ট করে গেছে বলে তো আর কাজ তেমনিভাবে পড়ে থাকতে পারে না।

আমি ওখান থেকে তাড়াতাড়ি অফিসে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু ডেস্কের কাছে না বসে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলাম।

কি করে পারলে গো তুমি? জিনাইদা কনস্তান্তিনোভ্‌না বললেন। তিনি পা টিপে টিপে আমার ঘরে ঢুকলেন, যেন রোগীর ঘরে ঢুকেছেন। আহা বাছা আমার, আস্তে আস্তে বললেন তিনি। এতদিন কত না কষ্ট সহ্য করেছ, কারো কাছে মুখ ফুটে বলনি। কিন্তু পারলে কি করে? এমন দুঃখ চেপে রাখলে যে, বুক খান খান হয়ে যায় গো। আর তোমার সম্মুখে রয়েছে সারা জীবন পড়ে।

না, না, আমার জীবন তো শেষ, আমি যেন অদ্ভুত এক স্বস্তির সঙ্গে বললাম, এ স্বস্তি বুঝি প্রায় সুখেরই সামিল। হাঁ, এবার আমি সহজে বলতে পারলাম আমার দুঃখের কথা।

তোমার শুধু ওকথা মনে হচ্ছে বইতো নয়, জিনাইদা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। আমার ষাট বছর বয়েস হোল, দুই ছেলে আর স্বামীকে বেশি দিন হারাইনি। এখন একা আছি। আমার জীবন সত্যিই শেষ। কিন্তু তবু তো দমি নি। আমরা বিজয়ী হব আমি দেখে যেতে চাই। নিনচ্‌কা বিশ্বাস করো, জীবনের সব-কিছুই মুহূর্তের ছায়া ফেলে চলে যায়, চিরদিন থাকে না। তোমার দুঃখও একদিন চলে যাবে—

না, না! বললাম।

বেশ, ধর তোমার দুঃখ যাবে না, কিন্তু কমে যাবে তার তীব্রতা, কেমন ভুলিয়ে যাবে। এমন দুঃখ নেই যা জীবনের কাছে

হার মানেনি। আর সেই তো সত্যিকারের আশীর্বাদ, তিনি ফিসফিস করে বললেন, যেন এক বিরাট রহস্যের সন্ধান দিচ্ছেন, তা না হলে আমরাই বা বাঁচতাম কি করে? এমন মানুষ নেই যার দুঃখ নেই। আমরা এক গভীর দুঃখ আজ অনুভব করছি— এ জাতির দুঃখ। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, জানি, এই দুঃখ বেশি দিন তো থাকবে না। শেষ হবেই। আসবে বিজয়ের দিন। তাহলে কে বলতে পারে, জীবন শেষ হয়ে গেছে? না, না, এ ঠিক নয়, ভালো নয়। তাই যদি করি, তাহলে তো মৃত্যুকে স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু জনগণ তো অমর। আমরাও তো অমর। হাঁ, বাছা, মৃত্যু নেই। শুধু আছে জীবন, জীবন। তোমাকে যা বললাম, এ নতুন নয়, কিন্তু সত্যি কথা। তার চাইতেও বুঝি বড় আর মহান, এ এক ধ্রুব বিশ্বাস। কয়েকবার তিনি আমার মাথা চাপড়ে দিলেন আদর করে: নিনচ্‌কা, নিনচ্‌কা বুঝেছ?

[চৌদ্দ]

সে দিন দেরি হয়ে গেল ফিরতে। ভলকভের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় গেল সময় কেটে। বেয়ারিং বিভাগের কাজ সম্পর্কে কয়েকটি সভাও হয়ে গেল। আমি বিছানায় শুতে যাব, এমন সময় বাড়িউলী দরজা দিয়ে তার মুখ বাড়িয়ে বলল, কারখানা থেকে কে একজন দেখা করতে এসেছে।

সে মিস্ত্রী ভ্‌লাসভ।

এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম বলে ক্ষমা করুন, সিগারেট লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনি কি ভাবে নেবেন

আমি জানিনা, নিনা পেত্রভ্‌না, কিন্তু আমি ব্যাপারটা এই ভাবে দেখেছি : লোকের উপর অত কড়া হওয়া ঠিক নয়।

কি বলছ তুমি?

ভলকভের কথা, ভ্যাসিলি ফেদরোভিচের কথা।

সে মুখ থেকে নামটা বার করতে না করতেই কেমন এক নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল। ওঃ তাহলে তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে এসেছ? আমি ঠাণ্ডা স্বরে মন্তব্য করলাম।

আপনি অবশ্য সে ভাবে ও ব্যাপারটা নিতে পারেন, নিনা পেত্রভ্‌না, ভ্লাসভ শান্ত ভাবে বলল, আমার সহানুভূতিহীনতাকে সে যেন উপেক্ষাই করল। ভ্যাসিলি ফেদরোভিচ আমার পুরনো বন্ধু। হাঁ, সত্যি কথা লুকোতে আমি চাইনা। লোকে বলে বন্ধুত্ব হচ্ছে বন্ধুত্ব, আর সত্য হচ্ছে সত্য। আমার সবচাইতে বড় বন্ধু হতে পাবে সে, কিন্তু সে যদি এই যুদ্ধের সময়ে পঞ্চাশ হাজার বল-বেয়ারিং ইচ্ছে করে নষ্ট করত, আমি নিজে তার ঘাড় মটকাতাম। আপনি আমার একথায় সন্দেহ করবেন না। আমার দেশের আমি শত্রু নই। কিন্তু নিনা পেত্রভ্‌না, আমি এখানে বন্ধুত্বের খাতিরে আসি নি। আমি এসেছি ন্যায় বিচারের জন্যে। ভ্যাসিলি ফেদরোভিচ বুঝতে পারে নি, সে কি করেছে।

হাঁ, তা তো বটেই। মাতাল হলে আর বুঝবে কি করে? আমি নিষ্ঠুর ভাবে বললাম।

না, সে মদ খায়নি। নিনা পেত্রভ্‌না, তার জীবনে এক নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হিটলারী দস্যুরা তার সবাইকে খুন করেছে।

আমি কেমন যেন ম্লান হয়ে গেলাম।

কি বলছ তুমি?

হাঁ, সত্যি কথা বলছি। সবাইকে খুন করেছে। ওরা ছিল টুলা জেলায়, ওখানকার এক গ্রামে ওদের বাড়ি। পালাবার সুযোগও পায়নি। আবার গ্রামখানা দখল করা হয়েছে। কাল ভ্যাসিলি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে। তার সব কিছু লিখেছে খুঁটিয়ে। নিনা পেত্রভ্‌না, সে কথা শুনলে শিরায় শিরায় রক্ত জমে যাবে। পরিবারে ছিল পাঁচজন। বার্বারা আলেকসাভ্‌না ওর স্ত্রী, বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। বড় ভাই ফেদর ফেদরোভিচ, থুখুরে বুড়ো, ভ্‌লাসব কর গুনতে লাগল, একটা আঙুল তার বাবার মতোই মেসিনে কেটে গেছে। বড় মেয়ে ত আপনারই মতো, নিনা তার নাম। সে লালফৌজের এক সৈন্যাধ্যক্ষের স্ত্রী, তাদের ছোট্ট ছেলে ভাসকা দাদামশায়ের নামে তার নাম। তাছাড়া আর একটি মেয়ে—একেবারে সবচাইতে ছোট, নাম নাটাশা, বয়েস পনেরো। হাঁ লোকে বলে, সুন্দরী বটে। আহা বেচারী, মরণের আগে ওকে সইতে হয়েছে মেয়েদের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য।

হা ভগবান, আমি ফিস্‌ফিস করে বললাম, হাতের আঙুলগুলো চেপে ধরলাম আবেগে। বেচারী ভলকভকে কত না গাল দিয়েছি! সে তো নিঃশব্দে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাত দুখানা তখন কাঁপছিল।

লজ্জার এক বন্যা আমার মুখ-চোখ-কাণ ছাপিয়ে চলে গেল।

উঃ কি দুর্ভাগ্য! ভগবান কি দুর্ভাগ্য! আমি বার বার বলতে লাগলাম, আগে কেন জানলাম না। সত্যি বিশ্বাস কর, আমি আগে কিছুই জানতাম না।

আমিও তো জানতাম না। কেউ জানত না একথা। ভ্‌লাসভ বলল, নিনা পেত্রভ্‌না, আপনিও তো চরম দুঃখ পেয়েছেন, চারদিকেই এমনি দুঃখ। আমি বলি, এখন কাজের এই ক্ষতি আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে, আমাদের বিভাগকে আমরা অপমানিত হতে দেব না। ভ্যাসিলি

ফেদরোভিচের নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। কিন্তু আসবে কি না ঠিক করে উঠতে পারে নি। আপনি কিভাবে নেবেন ব্যাপারটা কে জানে! তাই আমাকে পাঠিয়েছে।

সে এখন কোথায়? বাড়িতে?

নিশ্চয়ই। আর কোথায় যাবে?

ওকি আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকে, না, শ্রমিকদের আস্তানায় থাকে?

শ্রমিকদের আস্তানায়। ষোলো নম্বরে ওকে পাবেন।

বেশ, চল এবার, আমি পেরেক থেকে কোটটা টেনে নিলাম।

এখন বড় দেরি হয়ে গেছে, তাছাড়া দূরও কম নয়, প্রায় তিন মাইল।

তা জানি। তার জন্য ভাবি না।

বেশ, ভ্‌লাসভ বলল, চলুন।

আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। একটা রাত। বরফ অনেকক্ষণ গলতে শুরু করেছে। পথ ঘাট শুকনো, হাঁটতে কষ্ট নেই। আকাশ মেঘে ভরা, চাঁদ ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। মাটিতে পড়েছে পত্রহীন গাছের কালো ছায়া। ঠাণ্ডা নেই,- কিন্তু মাঝে মাঝে ভলগার গলানো বরফের ভিতর দিয়ে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া।

আস্তানা পথ থেকে দূরে, একটা ছোট্ট অ্যাসপেন ঝোপের ভিতরে। আমরা গাড়ি-বারান্দার সামনের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। একটা ছোট্ট হল, সেখানে একটা মস্ত কেৎলি রয়েছে। একেবারে আস্তানার শেষে গিয়ে মিলল ভলকভের কুঠরী। এক ধারে একটা ষ্টোভ রয়েছে। ভলকভের বুট জোড়া একটা তাকের ওপর শুকোচ্ছে, দেখেই আমার বুকখানা টন টন করে উঠলো ব্যথায়।

ভলকভ ইলেকট্রিক আলোর ধারে একটা টুলের উপর বসে আছে। কালো কাগজের ঢাকনি মোড়া আলো, তারই ভিতর দিয়ে আলো এসে

ছলকে পড়ছে তার গায়ে আর মেঝেয়।

পাৎলুনের বোতাম লাগাচ্ছে, তিনটে আঙুল দিয়ে ধরেছে ছুঁচ, পুরুষরা এমনি করেই ছুঁচ ধরে। তার মোটা নাকে চশমা, তার চোখ দুটো বেশ বড় দেখাচ্ছে, ষাঁড়ের চোখের মতো। হাড়-সার পা দুখানা দেখা যাচ্ছে পা-জামার ভিতর দিয়ে। আমার গলায় যেন কি আটকে গেল।

ভ্যাসিলি ফেদরোভিচ, তাড়াতাড়ি বললাম, তোমার এই দুর্ভাগ্যের খবর তো আমি জানতাম না। যদি পার, আমাকে ক্ষমা করো।

সে কেমন হকচকিয়ে গেল। আমাদের আসতে সে দেখেনি। পা দুটো লুকোবার কি চেষ্টা!

আপনারা এসেছেন বলে বহু ধন্যবাদ। একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটু ঠিক হয়ে নিই, সে বিড বিড় করে বলল।

আমি পেছন ফিরতেই সে পোশাক পরে নিল। যখন মুখ ফেরালাম, দেখলাম পোশাক আর জুতো সে পরে নিয়েছে, চোখে আর চশমাও নেই। অন্ধ রাগে তখন যা দেখতে পাইনি, এবার দেখলাম। সে বুড়ো হয়ে গেছে, কোমর গেছে বেঁকে, তার চোখ দুটোব চামড়া কোঁচকানো আর কি বিষণ্ণ তাদের দৃষ্টি! জলভরা চোখ দেখে মনে হয় এতো পুরুষের চোখ নয়, কোনো বৃদ্ধা বহুক্ষণ ধরে কেঁদেছে। তার গলার শিরাগুলো পর্যন্ত কাঁপছে।

আমি তার হাত নিজের হাতে নিয়ে চেপে ধরলাম, আমাকে ক্ষমা কব, অনুনয় করলাম, ক্ষমা কর!

না, না, দোষ তো আমারই, সে বলল, আমি পঞ্চাশ হাজার বেয়ারিং নষ্ট করেছি—কি সর্বনাশ আমি করেছি! কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিনা পেত্রভ্না, আমি জানিনা, কি করে এমন হোল। আমি দাঁড়িয়ে

কাজ করছিলাম, কি করছিলাম নিজেরই খেয়াল নেই। চোখের সমুখে তখন ভাসছিল: ওরা আমার পরিবারের সবাইকে খুন করেছে। নাটাশাকেও। শুধু খুন করেই তাকে ক্ষান্ত হয় নি। তার আগে ঐ পশুরা তাকে অপমান করেছে, ধর্ষণ করেছে।

তার মুখখানা বদলে গেছে, মনে হচ্ছে এখুনি সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। এক শুষ্ক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে যেন উত্তপ্ত অশ্রুর ঢেউকে বাধা দিতে চাইল।

আন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমিও চিৎকার করে কাঁদিনি। তাই বোধ হয় দুঃখ গত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার অবরোধ এবার বুঝি ভেঙে গেল। আমি ভলকভের গলা জড়িয়ে ধরে তার কোটে মুখ রেখে কাঁদলাম। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছিল কান্নার আবেগে। উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল গাল বেয়ে। ঠোঁটে আর গলায় কেমন নোনা স্বাদ। নিজেকে শান্ত করতে সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হোল।

পরে আমার ঘরে, বালিশে মাথা দিয়ে আবার কাঁদলাম। কেঁদে কেঁদে ক্লান্তি এল। আন্দ্রের জন্য কাঁদলাম, কাঁদলাম আমার নিজের জন্য, আমাদের প্রেম আর হারানো সুখের জন্যও চোখে ধারা নামল। ঐ নিঃসঙ্গ নারী জিনাইদা কনস্তান্তিনোভ্‌না আর ঐ খুদে স্পেন দেশীয় ছেলে জোসিয়া—ওদের জন্য ঝরল জল। জোসিয়ার বাবা তো মাদ্রিদের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। আর কাঁদলাম আমার এই অপমানিতা, লাঞ্ছিতা দেশের জন্য। ভলকভের উৎপীড়িত, নিহত পরিবার আর সেই ছোট্ট মেয়ে নাটাশা, মৃত্যুর আগে সয়েছে চরম লাঞ্ছনা, তার জন্যও কাঁদলাম। সেই অবিশ্বাস্য অমানুষিকতার ছবি চোখের সামনে এমন জীবন্ত হয়ে উঠলো যে দুঃখে আর রাগে উঠলাম গর্জন করে।

পরদিন আর দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র রইল না, কিন্তু এক রাতে আত্মিক শক্তি বেড়ে গেল। এমন এক শক্তি পেলাম, যা আমার শরীরকে চাঙা করে তুলবেই। এখন বুঝতে পারলাম, আমার বাঁচার অর্থ কি। কি আমি করব। বরফ জলে মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম কারখানায়। এসে দেখলাম, ভলকভ এরই মধ্যে এসে গেছে। আমরা কাজ শুরু করে দিলাম।

বহুদিন থেকেই আমি দুটো মেসিন একসঙ্গে জুড়ে উৎপাদন বাড়াবার জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। খানিকটা এগিয়েও ছিলাম কাজে, কিন্তু নানা কারণে ব্যাপারটা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন পরিকল্পনাটা কাজে খাটাবার দরকার হয়ে পড়ল। আর কোনো উপায়ও ছিল না। আবার খসড়া আর স্কেচ আঁকায় মন দিলাম। সবাই তখন কারখানার মান রাখবার জন্য প্রাণপণ খাটছে। তারা মাস শেষ হবার আগেই বেয়ারিং-এর এই ক্ষতি পুরিয়ে দেবে।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, তখন মেসিন ঠিক হোল। ভ্‌লকভ এসে দাঁড়িয়েছে তার জায়গায়। সে বলল, যতক্ষণ না সে নিয়মিত কাজের দু'গুণ করছে ততক্ষণ সে জায়গা ছাড়বে না। আমি ওর পাশে চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাজ করলাম। হাঁ, সফল হলাম বইকি। আমাদের যা উৎপাদন করবার কথা, তার চাইতে ঢের বেশি করলাম।

[পনেরো]

আপনার নিশ্চয়ই বেয়াল্লিশ সালের বসন্তের কথা মনে আছে। দেরি করে এল বসন্ত। কি ঠাণ্ডা আর বর্ষণ সে নিয়ে এল। মে মাসে কয়েকবার তুষার ঝড়ের আশঙ্কা দেখা গেল। বড় বড় গলিত তুষার

স্তূপ ভেসে বেড়াল ভলগায়। নদী-খাল ছাপিয়ে উঠলো, রাস্তায় কাদা। সীমান্তে সীমান্তে তখন ক্লান্তিকর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। কারখানায় অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা হয়েছে; ক্লাব, লাইব্রেরী, অভিনেতা আর গাইয়েরা সবাই আছে। সত্যি, কারখানায় যখন ঘুরে বেড়াই বিশ্বাস করতে পারি না যে সাত মাস আগে এখানে জঞ্জালের গাদা ছিল।

জীবনে কোনো পরিবর্তন হয় নি একটা ছাড়া। এখন আমি শহরের বাইরে থাকি। জিনাইদা কনস্তান্তিনোভ্‌না আমাকে তাঁর নতুন ফ্ল্যাটে এনেছেন। ডাক্তারদের জন্য এ বাড়ি নতুন উঠেছে। তিনি আমাকে একখানা ছোট ঘর দিয়েছেন, ভলগার দিকে মুখিয়ে একটা বড় জানালা, বুলেভারও দেখা যায়। বুলেভারে ঠিক জেলার রঙ্গালয়ের সুমুখে কাপাযেভের কালো বর্ষাভেজা মূর্তি, এক হাতে বাঁকা তলোয়ার উঁচিয়ে আছেন, ককেসীয় ফারের টুপী তাঁর মাথায়।

আমার ঘরে আসবাবপত্র বেশি নেই। একখানা ছোট্ট খাট, একটা প্লাইউডের ছোট্ট টেবিল আর চেয়ার। আমার কাপড়-চোপড় সুটকেসে রাখি। শুধু সব চাইতে ভাল পোশাকটা রেখেছি দোরের আড়ালে ঝুলিয়ে, একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। টেবিলে কাপড় পেতে তার উপরে রেখেছি আমার আরসী, আমার অ-দ্য-কলোঁর শিশি, এসেন্স, বোতলটা ক্রেমলিন টাওয়ারের মতো দেখতে, আর একটা বাক্স, তাতে আন্দ্রের চিঠি আর আমার আর একটি সম্পদ—আন্দ্রের আর আমার আবছা একখানা ফোটো। সেবাস্তপুলের বুলেভারে প্যানোরামা বিল্ডিং-এর কাছে তুলেছিলাম।

জিনাইদার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হোল, আর আমার ঘরখানাও বেশ ভালই লাগছিল। হোক ছোট ঘর, নাই-বা থাক বেশি আসবাবপত্র।

বহু সময় গায়ে শাল ঢাকা দিয়ে ঠাণ্ডায় শিটিয়ে যাওয়া আঙুলগুলো রগড়াতাম জানালায় দাঁড়িয়ে, আমার চোখ চলে যেত ভলগার ওপারে পশ্চিমে বহু দূরে। ভলগার ওপারে ঢালু বালির চড়ায় চারা গাছের ঝোপ, জলভরা মেঘের পটভূমিকায় ঝোপঝাড় যেন আরো সতেজ শ্যামলিমা নিয়ে ফুটে উঠেছে, দূর দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে সবুজ আর নীলে। বহু সময় দেখতাম আর আড়ষ্ট আঙুলগুলো রগড়ে রগড়ে সজীব করে তুলতাম। নীল আর সবুজের এই সংমিশ্রণ সবচেয়ে আমাকে মনে পড়িয়ে দিত আর এক ভীষণ-মধুর সংমিশ্রণের কথা। বসন্তের শ্যামলিমা আর যুদ্ধের বিষাক্ত নীল ধোঁয়া …

একদিন কাজ সেরে গোধূলির আলোয় ফিরলাম বাড়িতে। কোট আর গ্যালোস হলে দাঁড়িয়ে খুলছি এমন সময় দেখলাম একটা ব্র্যাকেটে একটা টুপি রয়েছে, নীল ফিতে আঁটা টুপিতে সোনালী সুতোয় সামরিক চিহ্ন আঁকা। নিচে পড়ে আছে আস্ত্রের ফিতে-বাঁধা ছোট্ট সুটকেস। আমার ঘরের দরজাও খোলা, ভিতরের দিকে তাকালাম, একজন বৈমানিক আমার টেবিলটার ধারে বসে দ্রুত কি লিখে চলেছে, লোকটা আমার অচেনা। ঘরে ঢুকে পড়লাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে সে উঠে দাঁড়াল, উর্দিটা ঠিক করে নিল, মাঝারি লম্বা, বেশ মজবুত শরীর, গায়ের রং তামাটে। দুটি সামরিক সম্মান সে পেয়েছে। তার ব্যাঁক দেখে, বুঝতে পারলাম সে ক্যাপটেন।

নিনা পেত্রভ্না? সে বলল, যেন প্রশ্ন নয়।

হাঁ!

ক্যাপটেন সাভুশকিন, সে তার পা দুটো জুড়ে সামরিক কেতায় অভিবাদন জানাল।

হাত বাড়িয়ে দিলাম, সে হাতখানা তুলে নিল, চুমু খেতে যাবে, এমন

সময় আমার মুখে দেখল কেমন এক বিভ্রান্তির ছায়া, হাতে জোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। কেমন লজ্জিত হয়েছে, তামাটে গাল দুটো আরো রক্তিম হয়ে উঠেছে, গোধুলির আবছা আলোয়ও টের পেলাম। সে তার সরু গোঁফের ওপর একবার হাত বুলিয়ে গলা খেঁকারি দিয়ে বলল :

আপনার স্বামী আর আমি একই সৈন্যদলে ছিলাম। এখানে কারখানা থেকে সীমান্তে বিমান পাঠাবার ব্যাপারে আমাকে পাঠানো হয়েছে। ভোরেই আবার ফিরে যাব। আমাদের সৈন্যদলের অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে…

সে একটু নুয়ে পড়ে তার ফিল্ড-ব্যাগের চামড়ার ফিতে খুলে একটা ছোট্ট বাণ্ডিল বার করে আমার হাতে দিল, তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে পেছন ফিরল, খুললাম বাণ্ডিল, আন্দ্রের হাতঘড়ি, তিনটে সামরিক চিহ্ন, সোভিয়েট ইউনিয়নের বীরের মর্যাদাসূচক একটি সোনার তারকা, একটি চামড়ার ব্যাগ ; আমার একখানা ফটো—সোয়েটার গায়ে, মাথায় শীতের টুপি—কি জানি কেন, দেখে নিজেকে কালো বলেই মনে হয়। এত হাত ঘুরেছে ছবিখানা, এখানে-ওখানে আবছা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে।

বহুক্ষণ আমি আন্দ্রের এই স্মৃতিচিহ্নগুলি হাতে নিয়ে বসে রইলাম, কি জানি, ওজন করে দেখছিলাম নাকি তার ভালবাসা, তার গৌরব, আর তার স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলি! কিছুতেই মনে হোল না, আন্দ্রে নেই, সে আর ফিরে আসবে না, তার অস্তিত্ব বলতে আছে শুধু এই কটা জিনিস। আমার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল,—কি ঠাণ্ডা সে জল!

ক্যাপটেন বললেন, আমি আন্দ্রে ভ্যাসিলিভিচের সুটকেসটাও এনেছি, ওতে কিছু জিনিস আছে, হল ঘরে রয়েছে, একজন প্রৌঢ়া আমাকে দোর খুলে দিয়েছিলেন…

সে আমার বাড়িউলী জিনাইদা, কনস্তান্তিনোভ্না।

হাঁ, আপনার ঘরের দরজা খুলে আমাকে তিনি ভিতরে এনে বসালেন। অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, কিন্তু আমাকে আবার ফিরতে হবে, তাই আপনার আসার আগে একটা চিঠি লিখতে শুরু করে ছিলাম। এবার অনুমতি পেলে স্যুটকেসটা নিয়ে আসি।

না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমিই পরে নিয়ে আসব। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ঘরে অন্ধকার জমে উঠেছে, কালো ঢাকনা-আঁটা আলো জাললাম, কেমন এক চাপা আলো ছড়িয়ে পড়ল। ক্যাপটেনকে চেয়ারখানায় বসতে বলে আমি বিছানায় বসে পড়লাম। এবার এল কেমন অস্বস্তিকর এক নিস্তব্ধতা।

নিনা পেত্রভ্না, সত্যিই কি আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি?

তাকে চিনলাম এবার, মনে ঘনিয়ে এল এক হঠাৎ-খুশি।

পেতিয়া!

হাঁ, আমিই তো!

জর্জিয়েভস্কি মঠ, বালাক্লাভা, গোলাপী মুস্কাটেল আর……

আমাকে ক্ষমা কর পেতিয়া! তোমার নাম যে সাভুশকিন তাতো জানতাম না।

হাঁ, ক্যাপটেন সাভুশকিন, এখন তো ঐ নামই চালু, কিন্তু শান্তির সময়ে শুধু পেতিয়াই ছিলাম, কেউ আমাকে অন্য নামে ডাকেনি। আমি কি খুব বদলে গেছি?

না, তা মনে হয় না, তবে একটু গম্ভীর হয়েছ, লম্বাও যেন দেখাচ্ছে, গোঁফও রেখেছ দেখছি।

হাঁ, এটা সীমান্ত যুদ্ধের দান, তাছাড়া, সে আমুদে পেতিয়াও আর নেই।

হাঁ, তাও দেখছি বটে।

এ পরিবর্তন তো হবেই, আমরা যে এখন লড়ছি, যুদ্ধে কি আমোদের স্থান আছে!

আন্দ্রু ইশা তার শেষ চিঠিতে তোমার কথা লিখেছিল, তোমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে ছিল। সর্বনাশ যেদিন ঘনিয়ে এল তার আগের দিন……

হাঁ, সর্বনাশই বটে, পেতিয়া ভ্রূ কোঁচকাল, হাঁ, তোমার পক্ষে তাই বটে, আমাদের পক্ষেও এক চরম আঘাত, আমাদের সমস্ত পল্টনের পক্ষেও। একজন সাথী আমরা হারালাম, হারালাম আমাদের প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষকে।

ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তুমি জানো, দেখেছ?

হাঁ, দেখেছি……আর বলতে কি, আমারই জন্য ব্যাপারটা ঘটল।

তোমার জন্য?

হাঁ, কিন্তু আমার কোনো দোষ ছিল না, সাত হাজার ফুট ওপরে আমরা তখন লড়ছি, ওরা আমার প্লেনে দিলে আগুন ধরিয়ে, আমি লাফিয়ে পড়লাম প্যারাস্থট নিয়ে। তিনটে শত্রুপক্ষের মেসারস্মিট আমার চারদিকে ঘুরেঘুরে মেসিনগান ছুঁড়ে আমাকে বিরক্ত করতে লাগল। একটা গুলি আমার কণ্ঠার হাড় ছুঁয়ে চলে গেল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিছুই তেমন হোল না। আর একটা লাগল পিছনে, সে এক বাস্তব দুঃস্বপ্ন, পালাবার তখন উপায় নেই, আমার প্যারাস্থট নিয়ে তখন অসহায়ভাবে ঝুলছি, সব আশা শেষ।

এমনি সংকট মুহূর্তে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল আন্দ্রে। সে প্লেন নিয়ে ঠিক নিচে চলে এল, ডানদিকে ঘুরে প্রায় একশ গজ দূর থেকে হুনটার ওপর চালাল গুলি, একটা প্লেনে আগুন ধরে গেল।

আবার আর একটা মেসারস্মিট উড়ে এলো আন্দ্রের প্লেনের পিছনে, আন্দ্রে আগেই টের পেয়েছিল, সে আবার নিচে নেমে এল, বাঁদিকে ঘুরে চালাল গুলি, প্লেনটা পালিয়ে গেল।

কিন্তু তেসরা প্লেনটা তখন উপরে উঠে এসে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করছে, আন্দ্রুইশা আবার আমার উপরে উঠে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল, এমনি করে তেসরা প্লেনটার আক্রমণ সে ঠেকিয়ে রাখল, আমি এদিকে নেমে এলাম। যুদ্ধ হচ্ছিল জার্মাণ এলাকায়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে হাওয়া তখন পূবে বইছিল, নিজেদের দিকে এসে পৌঁছলাম।

আমাকে নির্বিঘ্নে নামতে দেখে আন্দ্রেই একেবারে নিচে নেমে এসে নিজের শিরস্ত্রাণ খুলে আমার দিকে একবার দোলাল। নিনা পেত্রভনা, আমি তখন ওর পিছন দিকে ফেরানো সুন্দর চুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। আন্দ্রেই হেডসেট নিয়ে উড়তে পছন্দ করত না, রেডিও ও পছন্দ করত না, খুব দরকার ছাড়া কখনো সে ব্যবহার করে নি। আবার যখন সে উপরে উঠে এল, এবার দেখলাম, আগুন জলে উঠেছে ওর প্লেনের ডান দিকে। দোসরা নম্বর প্লেনটা বোধ হয় ফিরে এসে তখন গুলি চালাচ্ছিল, আর একটা প্লেনও দেখলাম গুলি চালাচ্ছে, কিন্তু আন্দ্রে আর গুলি চালাচ্ছে না, বোধহয় ওর গুলি-গোলা তখন ফুরিয়ে গেছে, অথবা ও সাংঘাতিক আহত হয়েছিল। দেখলাম প্লেনটা কেমন হুমড়ি খেয়ে উলটে যাচ্ছে, ও প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে সোজা করে নিয়ে রওনা হোল আমাদের বিমান-ঘাঁটির দিকে, ওর পিছনে কালো মেঘের মতো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছিল। শেষ চেষ্টা করে ও এসে পৌঁছল বিমানঘাঁটিতে, নেমে এল বিমান। যখন ওরা ওকে ধরাধরি করে বার করে নিয়ে এল, দেহে তখন প্রাণ ছিল না, ডান হাতখানা তার

পুড়ে গেছে, লিভারে বিঁধেছে গুলি।

ওরা যখন আমাকে ঘাটিতে নিয়ে এল, আন্দ্রেইশাকে তখন ফার ঝোপের ছায়ায় ছোবরা চাপা দিয়ে বরফের ভিতরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

হাঁ, ভগবান! চিৎকার করে উঠলাম, সারা দেহ আমার কাঁপছিল।

এযে যুদ্ধ, নিনা পেত্রভ্না, পেতিয়ার গম্ভীর স্বর ঝরে পড়ল, আমাদের কোনো উপায় নেই। আন্দ্রেকে ওরা পরদিন কবর দিল, সে তাড়াতাড়ি বলল; আমার আবেগ যেন তাকে অভিভূত করে তুলেছে, আমি সে সময়ে ছিলাম না, ওরা আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু তুমি হয় তো……কিন্তু আমার মনে হয়, না দেওয়াই উচিত ছিল……

কি? কি? আমি খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললাম। সে তার ব্যাগ থেকে একখানা খাম বার করল, তার ভিতরে ক'খানা ছবি।

ছাপা ভাল হয়নি, কাগজটাই বাজে, সে বলল। দেখলাম ছবি, আন্দ্রে শুয়ে আছে কফিনে, ঘুমন্ত আন্দ্রে, তার চুল নিখুঁতভাবে পালটানো, তার চিরপরিচিত মুখখানি একটু বদলে গেছে, নাকের উপরে একটা ক্ষত, মাথা রয়েছে ফারগাছের ডাল-পালার ভিতরে, বরফের উপরে কফিন নামানো, লাল ফৌজের দুজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাঁধে মেসিন-পিস্তল। তারা দুজনে দুধারে কফিন ধরে আছে!

আর কয়েকটি ছবি—কবর দেওয়া হয়ে গেছে, সামরিক অভিবাদন, আন্দ্রের ভস্মীভূত প্লেন, গ্রাম্য গির্জার দৃশ্য, আন্দ্রের কবর।

আমি এগুলো রাখব? জিজ্ঞেস করলাম।

হাঁ, রাখো, পেতিয়া উত্তর দিল, তোমার জন্যই এগুলো তোলা।

[ষোলো]

আন্দ্রের কথা পেতিয়াকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, সে আমাকে তারিখের পর তারিখ দিয়ে বলে গেল আন্দ্রের জীবনের শেষ মাসটির কাহিনী।

আমি ব্যগ্র হয়ে শুনলাম, ওর কথা, প্রতিটি কথার জন্য তখন আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু ওর কাহিনী বড় ছোট, ওর কাছ থেকে আমার হৃদয় আরো দাবী জানাল। সেও খুঁটিনাটি সব-কিছু বলল, কিন্তু আমার সে বুভুক্ষা তো মিটল না। আমি চাইলাম আন্দ্রেকে, জীবন্ত, প্রেমময় আন্দ্রেকে, হাঁ, পুরোপুরি না পাই অন্তত আংশিকভাবেও তাকে জিইয়ে রাখতে চাইলাম ; আমার যে প্রয়োজন।

যখন বারোটা তখন আমার খেয়াল হোল, পেতিয়াকে তো চা দেওয়া হয়নি, তার আঘাতের কথা তো জিজ্ঞেস করিনি। তুমি ঝাঁপিয়ে পড়লে ? জিজ্ঞেস করলাম।

কি করব, পেতিয়া বলল, আমার বিমানে তখন আগুন ধরে গেছে, নিচে পড়ে যাচ্ছে, সোজা করবার আর উপায় নেই, তখন ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া, বিমান-বিভাগের নিয়ম অনুসারে, তখন প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বার অধিকার আছে বই কি !

হাসলাম, হাসি চাপতে পারলাম না, তোমরা কি অদ্ভুত লোক গো ! বললাম, তোমরা কি দিয়ে তৈরী ? একজন মানুষ জ্বলন্ত প্লেন থেকে জীবন রক্ষা করবার জন্য লাফিয়ে পড়েছে, তার জন্য সে ওজুহাত দেখাচ্ছে, নিজের অধিকারের কথা বলে সমর্থন করছে নিজেকে।

বাঃ, নিশ্চয়ই! গম্ভীর স্বরে বলল পেতিয়া, নিনা পেত্রভ্‌না, অন্ত উপায় কি বল! প্লেন আমাদের অস্ত্র, যখন চরম বিপদ এসে হাজির হয়, অন্য উপায় থাকে না, তখনই আমরা প্লেন ছাড়তে পারি। না, না, এ ঠাট্টা নয়।

এবার চা খেলাম আমরা। জিনাইদা এসে যোগ দিলেন। পেতিয়াকে তার ভারি পছন্দ হোল।

ভালো কথা, জিনাইদা বললেন, আমাদের মস্ত ভুল হয়ে গেছে, আমার মনে হয় ক্যাপটেন সাভুশকিনের একটু ভোদ্‌কা হলে আপত্তি নেই, কি বলেন?

আছে নাকি? পেতিয়া জিজ্ঞেস করল।

না, ওসব তো রাখি না, তিনি বললেন, তবে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল আছে, তাতে হবে?

নিশ্চয়ই।

লোকে বলে, অ্যালকোহলে গরম জল মেশালেই নাকি চমৎকার ভোদ্‌কা হয়।

না মেশালেও হয়, পেতিয়া বলল।

বেশ, আপনার যেমন ইচ্ছে।

জিনাইদা চলে গেলেন অ্যালকোহল আনতে, আমি ইলেকট্রিক স্টোভে কিছু আলু সেদ্ধ করে নিলাম, একটা মাছের টিন খুললাম, দেখলাম হেরিংই বটে। একটা পেঁয়াজ, একটু ভিনিগারও পাওয়া গেল। চমৎকার এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন হোল।

পেতিয়ার নিষেধ সত্ত্বেও অ্যালকোহলে জল মিশিয়ে নিয়ে একটা ডিকেণ্টারে পুরলাম, একটু উৎসবের আমেজ যেন তাতে এল।

কমরেড, আসুন আমরা আগ্নেয় উদ্দেশ্যে পান করি, পেতিয়া

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

হাঁ, আন্দ্রের উদ্দেশ্যে—বললাম।

আমরা পান করলাম, উগ্র পানীয়ের ঝাঁঝে মুখ বিকৃত করলাম।

পেতিয়াকে দেখে মনে পড়ল কালাক্লাভার সেই ভোজের কথা, কি আমোদ সেদিন! আন্দ্রেকে যেন দেখতে পেলাম, দেখতে পেলাম বালির উপরে আঙুরের পাতার ঝালর-দেওয়া ছায়া, রুক্ষ কঠিন টিলা, ঘননীল সমুদ্র—জুলাইয়ের সেই দিনটি পরিপূর্ণ হয়ে এল আমার কাছে। সেতো আর ফিরবে না!

চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। স্মৃতিমগ্ন। এমন সময় দোরে জোরে ধাক্কা পড়ল, ড্রাইভার পেতিয়ার খোঁজ নিতে এসেছে। পাঁচটা বেজেছে, এখন আর আমাদের শোবার সময় নেই। পেতিয়া আমাদের কারখানায় পৌঁছে দিতে চাইল, বিমানঘাঁটিতে যেতে পথে পড়বে কারখানা।

বাসে বৈমানিক আর মিস্ত্রীদের ভিড়, তবু তারই ভিতরে আন্দ্রের সম্বন্ধেই কথা হোল। পেতিয়া এক সময়ে আমাকে বলল, নিনচ্‌কা, আন্দ্রের কবর দেখতে একবার সীমান্তে যাবে না?

এযে সম্ভব আমি ভাবতেও পারিনি, কিন্তু এবার আমার কল্পনায় জুড়ে বসল এই চিন্তা, ওর কবরের কাছে কিছুদিন থাকব, ফুল দেব ওর কবরে। মনে হোল, আন্দ্রের কবরই বুঝি আবার তার সান্নিধ্যে এনে দেবে।

তা কি সম্ভব? জিজ্ঞেস করলাম।

কেন নয়? পেতিয়া বলল, আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। সীমান্তের প্রধান সামরিক ঘাঁটি থেকে তোমার ডাক আসবে।

উঃ, কি ভালই হয় তাহলে!

কারখানার বাইরে সে বিদায় নেওয়ার সময় বলল, ফিরেই তোমাকে লিখব, কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, শীগগীরই আবার দেখা হবে।

সেই দিন থেকে আন্দ্রের কবর দেখার এক উন্মাদ কামনা আমাকে পেয়ে বসলো। পেতিয়ার চিঠির অপেক্ষায় অসহিষ্ণু হয়ে কেটে চলল দিন, মে মাস চলে গেল, জুন এল, তবু চিঠি এল না। তারপর শুরু হোল জার্মান অভিযান নতুন করে। অপেক্ষা করে রইলাম, বুকে তখনো আশা, অবশেষে এল চিঠি, দ্রুত লেখা চিঠি, খানিকটা রুক্ষও তার সুর, একটা নোট পেপারে পেন্সিল দিয়ে লেখা। চিঠি নিয়ে এল হতাশা!

এখন সীমান্তের পরিস্থিতি জটিল। (পেতিয়া ব্যাখ্যা করছে) আমরা এখন চলার উপরে আছি, তোমাকে আসতে বলার কথা লেখা বৃথা, তাছাড়া, আন্দ্রের কবরের জায়গাটা আমাদের প্রতিরোধ এলাকার অনেক পশ্চিমে, কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ো না, নিনা! আমরা পেছু হটে আসার সময় কবর থেকে কাঠের ফলকখানা খুলে নিয়ে এসেছি, কবরের কোনো ক্ষতিই হবে না। আমার তোমার সঙ্গে দেখা হবার দিন গুনছি, কিন্তু শীগগীর যে হবে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে কিছু ভাবতে পারছি না। সময় পেলে চিঠি দিও, তোমার চিঠিতো আমার আনন্দ।

তোমার বন্ধু পেতিয়া।

[সতেরো]

তেসরা জুলাই, আট মাস বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের পর আমাদের সেনাবাহিনী সিবাস্তপুল পরিত্যাগ করেছে।

এই সংবাদ বেরুল সোভিয়েট সংবাদ-বিভাগের সান্ধ্য ইস্তাহারে।

সেই সূর্যোজ্জ্বল বিষাদময় দিন তো আমি ভুলতে পারব না। ধুলো উড়ছিল, মাঝে মাঝে বইছিল জ্বলন্ত হাওয়ার ঘূর্ণি, সেদিনও তো ভোলা

যাবে না, কত স্মৃতি সেদিন উঠে এল বুকের গোপন কন্দর থেকে, আমি ক্ষতবিক্ষত হলাম।

ছেলেবেলায় একবার গ্রীষ্মকালে সূর্যগ্রহণ দেখেছিলাম, আপনার হয়তো মনে আছে, সেবার আংশিক গ্রহণ হয়েছিল। এ দিনটি যেন তেমনি উজ্জ্বল আর জলন্ত, তেমনি অস্বস্তিকর হাওয়া বইছিল, গাছের পাতা যেন ধাতুর চক্রের মতো ঝলসাচ্ছিল রোদে। সূর্যের সেদিন প্রখর তাপ, তাকালে যেন চোখ ঝলসে দেয়, প্রকৃতি তার আক্রমণে নিস্তেজ, গাছের পাতা হারিয়ে ফেলল তার স্বাভাবিক রঙ। ক্রাসনিয়া প্রেসনার আমাদের কাঠের বাড়ির দেয়ালে এক বুনো আঙুর-লতা উঠেছিল, সেদিন তার ছায়া যেন অদ্ভুত হয়ে দেখা দিল, আমার তখন কেমন ভয় করছে। একজন আমাকে একখানা রঙীন কাঁচ দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে বলল। কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, চারদিকে যেন মখমলের মত লাল ঝুল পড়েছে সূর্য যেন খুদে একটা সাদা বল, তার একটা দিকের একটুখানিতে পড়েছে কালো ছায়া। কালো ছায়া বাড়তে লাগল, শেষ সূর্যের একটা মাত্র টুকরোই রইল, যেন সরু নখের মতো এক চিলতে।

কি ভয়ংকর দেখতে! কাঁচ নামালাম চোখ থেকে, আকাশের ঠাণ্ডা ছায়া আর সব ছায়া ঢেকে ফেলল। সূর্য যেন আর সূর্য নেই,- এক শীসের তারা অন্ধকার আকাশে নিঃসঙ্গ লেগে আছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, মা এসে আমাকে অনেক করে শান্ত করলেন। গ্রহণ শেষ হোল, কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে পরদিন পর্যন্ত শুধু মনে হোল, পৃথিবীতে যেন যথেষ্ট আলো নেই, সব-কিছুর চারদিকে যেন শোকের কালো রেখা টানা। হাঁ, এমনি অনুভূতি আবার ফিরে এল জুলাইয়ের সেইদিনে, যখন শুনলাম সিবাস্তপুলের পতন হয়েছে, আপনাদের মনেও বোধহয় আমারই মতো প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

সিবাস্তপুল—আমাদের প্রেমের শহর! শূন্য দিনগুলি তো ওরই স্মৃতি দিয়ে ভরে রাখতাম, সে দিন তো আর ফিরে আসবে না, আমি আর আন্দ্রে সেদিনটি কাটিয়েছিলাম ঐ শহরে।

কিছুতেই খবরটা আমার স্মৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম না। সেই সিবাস্তপুল আজ আটমাস ধরে শত্রুর আক্রমণ সহ্য করেছে। ইস্পাত নীল আর সবুজ বারান্দাওলা বাড়ির সব ধ্বংস হয়ে গেছে, ধসে পড়েছে চূন আর বালির ঝড় তুলে! ফুলের বাগিচা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সব গেছে, পথ ঘাট গর্জমান বোমায় ক্ষতবিক্ষত, পাথর আর পিচের মাঝে মাঝে গভীর খাত, পথের ধারের গাছগুলো গেছে পুড়ে!

তবুও এই শহর তার ভগ্নাবশেষ নিয়েও ছিল আমাদের, তার শুকনো ঈষৎ গোলাপী মাটি ছিল আমাদের, আমাদের ছিল স্তেপ, ছিল সমুদ্র, আর শাদা শামুকের দল, ছিল কারসোনেস্‌কি বাতিঘর, বালাক্লাভা, ছিল ফিয়োলেন্ত অন্তরীপের কাছে সেই ছোট্ট দ্বীপ, ওখানে শুয়ে শুয়ে হাতের উপর শির দিয়ে কতদিন দেখছি ক্রাইমিয়ার চাঁদকে।

কিন্তু আজ তো সেখানে শান্তি নাই।

আমার আন্দ্রে আর সিবাস্তপুল আর নেই। নেই সেই হাসিখুসি মেয়েটি, এক নিঃসঙ্গ নারী, যেন আর কেউ সে। নিনা পেত্রভনা, ইঞ্জিনিয়ার পেত্রভনা নামে এসে জুড়ে বসেছে সেখানে। সে কারখানার ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভলগার হাওয়া এসে তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আত্মা তো সেখানে নেই—সে ঘুরছে আমাদের মধুচন্দ্রের সেই উজ্জ্বল জগতে, সিবাস্তপুলে। তখন তরুণী আমি, প্রেমে পড়েছি, আন্দ্রে, সুখী আন্দ্রে, লাজুক আন্দ্রে আমার সাথী।

আন্দ্রে আর আমি সেদিনটা আনন্দেই কাটালাম, হাঁ, একটা সত্যি-কারের ছুটির দিন পেলাম আমরা।

সিবাস্তপুলে ভোরে উঠে পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম, চুমু খেলাম। তারপর গেলাম সাঁতার কাটতে, ফিরে এলাম যেন নতুন জীবন নিয়ে। একটা কাফেতে ঢুকে প্রচণ্ড ক্ষিধে মেটালাম, কাঁচের পাত্রে কাগজের ঢাকনি আঁটা ইউগহাওর্ট খেলাম, চামচে দিয়ে কাগজ ফুটো করে খেতে হোল। তারপর বেরুলাম বেড়াতে। সুন্দর পথ বিছিয়ে আছে, দিনটাও গরম। আন্দ্রে তার কোট খুলে ফেলে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিল। তার বাহুতে শক্তির ইঙ্গিত। খুব ভাল লাগলো, এমন ভাবে তাকিয়ে রইলাম যেন প্রথম দেখছি।

হাতধরে তার বাহুতে বাহু জড়িয়ে চললাম, তার কত বড় বাহু, আর আমার কত ছোট! তার স্পর্শ উষ্ণ, আমার শীতল। তবু যেন মিশে গেল, মিলে গেল। মা যেমন সন্তানের সঙ্গে এক, অভিন্ন হয়ে যায়, তেমনি আমরাও হলাম।

আন্দ্রের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে জোরে চাপ দিলাম, সে আমার কানের উপর চুমু খেল, বিব্রত হয়েছিল বলেই সে চুমু পূর্ণতা পেলনা।

দুষ্টু! পথে, সবার সামনে!

কি হয়েছে? ওরা আমাকে ঈর্ষা করুক, তাইতো আমি চাই, আন্দ্রে বলল।

আমরা একখানা নৌকো ভাড়া করে চললাম কারসোনেসে, সেখানে মাটি খুঁড়ে প্রাচীনকালের এক শহর বার করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ বাড়িগুলো দেখলাম, প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন তারা। এখানে ওখানে মাটির ঢিপি, তার উপরে বুনো ফুলের ঝোপ, লাল আর হলদে ফুল ফুটে আছে, আকাশের পটভূমিকায় আরো স্পষ্ট দেখাচ্ছে। বার্চ গাছের বড় বড় ডাল ছড়িয়ে আছে, রূপোলি বাকলে জমেছে ধুলো; বড় বড় হলদে জাম থোলো থোলো ধরে আছে, কোনটা বা ঝুঁকে পড়েছে প্রাচীন শহরের দেয়ালের

উপর, ছোট ছোট পাথরের মতো সাদা সরীসৃপ ফণা মেলে রোদ পোয়াচ্ছে, চোখ মিট মিট করছে। এরাও পৃথিবীর কাছে নীল আকাশের মতোই বুঝি প্রাচীন!

আমরা সুরঙ্গ পথে ঘুরলাম, নির্জন যাদুঘরের ঠাণ্ডা ঘরগুলো পড়ে আছে, কোথাও দেয়ালের ধারে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে কলসীগুলো, লম্বা গলা, এক সময়ে এইসব কলসীতে মদ, জল আর তেল রাখা হোত। কাঁচের আলমারিতে পুরনো দিনের রৌপ্য মুদ্রা, ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাতার মতো পাতলা হয়ে গেছে। কোথাওবা ঘট, মাছধরবার সরঞ্জাম, তীরের ফলা, ক্ষুদে ব্রঞ্জের মূর্তি, ছোট ছোট প্রদীপ, বালা, চিরুণী আর নানা রকম যাদুঘরের আবর্জনা। বেশিক্ষণ আমার ভালো লাগলনা এসব দেখতে, বাইরের বিশুদ্ধ হাওয়া, সূর্য আর সমুদ্র তখন আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

চল এবার যাই, যথেষ্ট দেখা হয়েছে, অসহিষ্ণু হয়ে বললাম। কিন্তু আন্দ্রে একটা আলমারি থেকে আর একটা আলমারি দেখে বেড়াতে লাগল। তার মুখে চোখে কৌতূহল, জিনিসগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আর ভাবছে।

যাদুঘরের বাইরে আমরা এসে দাঁড়ালাম একখানা প্রায় গোল ফলকের কাছে, এযেন অনুশাসনের মতোই একটা-কিছু—খুব ভারি ধূসর মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী ফলকখানা, এত পুরনো যে কালো হয়ে গেছে। আন্দ্রে উৎকীর্ণ-লিপি পড়ে শোনাল।

আন্দ্রে বলল, ও এই লেখা, তুমি বুঝতে পারছ, নিনচ্কা?

হাঁ একেবারে কাদার মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে, হেসে বললাম।

বেশ, আন্দ্রে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল: কি লেখা আছে জানো? এই মর্মর সমাধির নিচে অলাস টেরেটিয়াস বালবাস ঘুমিয়ে আছে, মার্কস অরেলিয়াসের রাজত্বকালে ইনি ছিলেন দ্বিতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাপতি,

বুঝেছ তো ?

হাঁ, এখন বুঝলাম।

দেখ, দেখ, শয়তান কোথায় এই বালবাসকে টেনে এনেছিল, আন্দ্রের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একেবারে পৃথিবীর শেষে এই ক্রাইমিয়ায় —এইখানেই পাগলটা মারা যায়।

সিবাস্তপুলে ফেরবার পথে কৃষ্ণ সাগরের নৌবাহিনীর গোলন্দাজির মহড়া দেখলাম। প্রথম মানোয়ারী জাহাজটা যে মুহূর্তে কারসোনেস্কিক বাতিঘরের কাছে এল, সেই মুহূর্তে তার ডেক থেকে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জাহাজ ঢেকে গেল ধোঁয়ায়, একমুহূর্ত পরেই দিগন্তে দেখা দিল ছটি আলোর সঙ্কেত, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। প্রতিধ্বনি মর্মর সমুদ্রের উপর যেন লোহার বলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। তখনো প্রতিধ্বনি থামেনি, আবার বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম, আবার প্রতিধ্বনি চলল গড়িয়ে, উন্মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে তারা মিশলো, তখন তাদের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, বোধহয় বালাক্লাভার পাহাড়ের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে ওরা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এ উজ্জ্বল দিনের স্মৃতির সঙ্গে এযেন খাপ খেতে চাইল না, অপ্রত্যাশিত এই ঘটনা যেন বেতালা বলেই মনে হোল। আমি আন্দ্রেকে জড়িয়ে ধরলাম, যেন কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই চাইছিলাম।

[আঠারো]

ঠাণ্ডা পড়ছে, নিনা পেত্রভনা ছোব্বা দিয়ে পা ঢাকল।

সিবাস্তপুলে যখন ফিরলাম, তখনো সান্ধ্যভোজের সময় হয়নি, আন্দ্রে আমাকে টেনে নিয়ে গেল, সিবাস্তপুলের সামরিক যাত্রঘরে।

আন্দ্রু ইশা, একদিনে দু দুটো যাদুঘর দেখা কিন্তু বড্ড বেশি হয়ে গেল না ?

নিশ্চয়ই নয়, আন্দ্রে উত্তর দিল, নিজেদের ইতিহাস জানতে হবে বৈকি।

যাদুঘরে তামার কামান, লোহার ঢালাই করা পিরামিড, কামানের গোলা, পুরনো ছেড়া খোঁড়া পাল, নিশান, জাহাজের মডেল এমনি নানা জিনিস সাজানো। তাছাড়া আছে পদক-আঁটা উর্দি-পরা নাবিক, গোলন্দাজ, পদাতিক আর সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লোকদের প্রতিমূর্তি, তাদের কাঠের মাচার উপর সারি সারি সাজিয়ে রাখা হয়েছে, দেখে জীবন্ত মানুষের চাইতে লম্বাই দেখায়। আমি এখনো যেন স্পষ্ট তাদের কার্ডবোর্ডের মসৃণ মুখ দেখতে পাচ্ছি, লাল গাল; ঝুটো গোঁফ জুলফি, আর কাঁচের চোখ নিয়ে তারা যেন উদ্ধত গর্বভরে তাকিয়ে আছে। তাদের উর্দির এখানে-ওখানে পবিত্র কবচ বাঁধা, কোথাও নেপথালেনের থলে ঝুলছে। যাদুঘরের ভয়ংকর গরমে একটা ক্ষীণ গন্ধ উঠছে ছাঁচে ঢালাই এই মানুষগুলির গা থেকে।

তবুও এই পালের আর নিশানের সংগ্রহ, এই নোঙর আর সাজান রাইফেল কেমন যেন মনকে নাড়া দেয়, রুশিয়ার অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্দ্রের চোখে তাই জল ঝরছে। বাইরে তখনো ক্রাইমিয়ার উজ্জ্বল দিন। চকচকে তামার খিলগুলো আর উঁচু জানালার তামার ঝন্‌কাঠ তখনো বাইরের গরম টেনে আনছিল ভিতরে, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা, তারই ভিতর দিয়ে ঘননীল আকাশ ঝলসে উঠছিল, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত ঝলসাচ্ছিল গরমে। থোলো থোলো ফল গাছে। সব কিছুই সুন্দর, আর সেই সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিল আমাদের আনন্দ।

এবার খিদে পেল। গেলাম বুলেভারে, একটা কাফের বারান্দায় বসে গেলাম, সমুদ্রের হাওয়া এসে বুলিয়ে দিয়ে গেল টেবিল-ঢাকনাগুলি। দিন

তখনো উদ্দাম, বয়েস তার খুব বাড়েনি। শহরের পথে পথে ঘুরলাম, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে সিরাপ বা বরফের মতো ঠাণ্ডা মদ খেলাম।

অবশেষে এসে পৌছলাম প্যানোরামা বিল্ডিং এর কোনে। এখানে এক ভ্রাম্যমান ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে ছবি তুললাম। ছবির পটভূমিকা হোল এক ফুলের কেয়ারী আর ফুলন্ত গাছপালা।

ফটোগ্রাফার তখন তার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে আমরা ঘুরতে বেরলাম।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে একটা গোলাকার মঞ্চের উপর এসে পৌছলাম। চারদিকে রেলিং ঘেরা মঞ্চটি। একখানা ছবির সামনে দাঁড়ালাম। সেবাস্তপুলের শুষ্ক গোলাপী রঙের স্তেপ। উষ্ণ আকাশ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে ভায়োলেট বর্ণ-বৈচিত্র্য। অসীম বিস্তৃতি ঘরের অনুজ্জ্বল আলোয় ঝলসে উঠেছে, আর তারই উপর দিয়ে সেনা-বাহিনা চলেছে গর্বভরে।

আর একদিকে উপসাগর, জ্বলন্ত নিস্পন্দ জাহাজের সার। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন জাহাজ; বাজছে দামামা, তিনরঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে ফরাসীরা আক্রমণ করতে আসছে এগিয়ে। নীল উর্দি-পরা একজন সামরিক কর্মচারী, নাক তার উন্নত, চিবুকে একগোছা দাড়ি, হাতে তার তরোয়াল। শত্রু এগিয়ে আসছে রুশ অবরোধ ভেঙে। বস্তা আর মাটীভরা ঝুড়ি এখানে ওখানে। তারই ভিতরে কামানের ভাঙা গাড়ির উপর তামার কামান দেখা যাচ্ছে, আহত নাবিকরা পড়ে আছে। দৈত্যের মতো একজন গোলন্দাজ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করচে। তার মাথার গোল টুপিটা পিঠের সঙ্গে চেপ্টে গেছে, সে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে শত্রু।

আর এক দেয়ালে এক আইকনের সুমুখে সারি সারি মোম জ্বলছে—একেবারে জীবন্ত ছবি। একজন ধর্মযাজক ব্রোকেডের জোব্বা পরে

মৃতের জন্য প্রার্থনা করছে। হাতে তার ধূপদান, ধূপ ছড়িয়ে পড়ছে। মাটিতে পড়ে আছে মৃত সৈনিকদের দল নিথর হয়ে। তাদের গায়ে জোব্বা, তারি ফাঁক দিয়ে বুক দেখা যাচ্ছে।

আন্দ্রে আর আমি এই নিশ্চল যুদ্ধের ভিতরে, আমরা যেন নিস্তব্ধতায় সেই সর্বনাশা দৃশ্যের সমারোহে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি, তারই রহস্যময় ভূমিকা গ্রহণ করেছি আমরা।

হঠাৎ স্পষ্ট শোনা গেল কামান-গর্জন—বুম, বুম, বুম, বুম, বুম, বুম, ! পর পর ছ'বার। নিথর নিশ্চল দৃশ্য যেন জীবন্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে। কামান, দামামা আর নিশান নিয়ে এগিয়ে এল সৈন্যদল। চমকে গেলাম। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম গোলন্দাজি কুচকাওয়াজের শব্দ ভেসে এসেছে সমুদ্র থেকে। কিছুক্ষণ পরেই ভীষণ শব্দ করে বিমানগুলো প্যানোরামা বিল্ডিং-এর গম্বুজের উপর দিয়ে উড়ে গেল। সে যুগে এমনি সামরিক পদ্ধতি ছিলনা, আন্দ্রে বলল, সে এক সম্পূর্ণ আলাদা যুগ। আকাশ-পথে যুদ্ধের তখনও রেওয়াজ হয় নি।

সূর্যাস্তের আগে আমরা সমুদ্রের ধারে ডেক চেয়ারে গিয়ে বসলাম। সূর্য আস্তে আস্তে ডুবলো সমুদ্রে, আমাদের পেছনে বাজছে ব্যাণ্ড, বাতাসে গোলাপ, মিগনোনেট আর ভিজে কাঁকরের গন্ধ। পায়ের শব্দ, হাসি আর স্বর ভেসে আসছে পথিকদের। নৌবাহিনীর জাহাজগুলো একে একে ফিরছে বন্দরে, সি-প্লেনগুলো শেষবারের মতো শহরের উপর চক্র দিয়ে উপ-সাগরে নেমে এল। ফেনা উঠছে, জল কেটে চলেছে ঘাঁটিতে।

রাতদুপুরে আমাকে বিদায় নিতে হবে, মন ব্যথায় ভরে গেল।

আন্দ্রে পা ছড়িয়ে চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে পাইপ খাচ্ছিল, তার চোখ সমুদ্রের দিকে, মুখখানা গম্ভীর, চিবুকে কাঠিন্য।

কি ভাবছ? জিজ্ঞেস করলাম।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে একখানা সমুদ্রের জলে-ধোয়া মসৃণ পাথরের উপর ঝাড়ল, তারপর রেখে দিল পকেটে।

তোমার আর আমার কথাই ভাবছি, চিন্তিত স্বরে সে বলল, ভাবছি এই যে একটুকরো জমির উপর আমরা প্রেমিক প্রেমিকা বসে আছি, তার কথা।

ওঃ এই নিয়ে এত ভাবছ ? আমি তার হাত তুলে নিলাম নিজের হাতে, চমৎকার এই উপদ্বীপ, গাইড-বুকে তো তাই বলে, আর কথাটি ঠিকই।

তোমার সঙ্গে আমি একমত, এর চাইতে সুন্দর হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু প্রিয়া, একথা কি তোমার একবারও মনে হয়েছে, আজ আমরা এই আশ্চর্য উপদ্বীপে, মানুষের অস্থির উপর দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ? হাঁ, হাজার হাজার অস্থি।

তা লোক তো মরবেই, বললাম।

সে আমার দিকে তাকাল, চোখে তার জিজ্ঞাসা, যারা মরেছে তাদের কথা আমি বলি নি। একদিন তো সবাইকেই মরতে হবে, যারা নিহত হোল তাদের কথাই বলছি। এই ছোট্ট জমিটুকুর দিকে তাকিয়ে দেখ, পাঁচ কোপেকের মতোই ছোট, এতবড় একটা গ্রহের তুলনায় তো কিছুই নয়। কিন্তু এই একফালি জমির উপর কত নিষ্ঠুর আর রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়ে গেছে। আর সত্যিই বুঝতে পারিনা, কেন, কেন এই যুদ্ধ হোল ? এর কারণ কি ?

তোমার কি মনে হয় ঐ রোমক সৈনিক অলাস টেরেনটিয়াস বালবাস তার মাতৃভূমি ইতালীতে দুঃখে দিন কাটাচ্ছিল ? আমি তোমাকে নিশ্চিত বলতে পারি, চমৎকার ছিল সে জীবন। ইতালীর জলবায়ু ভালো, সুন্দর দেশ। রুটি, মদ, পনীর, তেল, কমলালেবু, আঙুর সেখানে অপর্যাপ্ত। তবে

সে কেন দেশে রইলনা, কেন সে চাষবাস করল না, ভার্জিল পড়ে কাটাল না তার অবসর? সে সন্তানসন্ততি নিয়েও তো সুখে কাটাতে পারত, নিজের দেশের মর্মর পাথর খোদাই করে গড়তে পারত মূর্তি—সে হোত রোমক শিল্পের নিদর্শন। কি খারাপ হোত তাতে? নিনচকা, তুমি কি সে-স্বর্গ ছাড়তে রাজি হতে?

কিন্তু তার পরিবর্তে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে অলাস টেরেনটিয়াস বালবাস তার তামার শিরস্ত্রাণ পরে, ধারালো দুধারি তলোয়ার আর বর্শা নিয়ে তার ইতালী ছেড়ে জাহাজে চড়ে চলল পৃথিবীর আর এক প্রান্তে—ক্রাইমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে কারসোনেসে। সে অঞ্চল তার অজ্ঞাত, তবু সেদিকেই হোল তার অভিযান। কেন? একথা জিজ্ঞেস করা যায় বটে। ভদ্রভাবে বলতে গেলে মহান রোম-সাম্রাজ্যের জন্য আর একটি নতুন উপনিবেশ অধিকার। আর সোজাসুজি বলতে গেলে, সত্যি বলতে গেলে, লুণ্ঠনই ছিল তার অভিপ্রায়।

হাঁ, সে লুণ্ঠন করল, দগ্ধ করল, করল হত্যা, ধর্ষণ, তারপর একদিন একখানা পাথর বা বর্শার আঘাতে হোল নিহত। তখন সামরিক অস্ত্র-সম্ভারের মধ্যে ঐ দুটিই শ্রেষ্ঠ, বালাক্লাভার সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষের কথা তোমার মনে পড়ে? একদিন একদল বিদেশী এসেছিল লুঠ করতে, তারা তাকে সাধু ভাষায় নাম দিলো: স্বাধীন বাণিজ্য। বিদেশী বণিকরা এক মৌলিক উপায়ে ব্যবসা চালালো, একহাতে রইলো মানদণ্ড, আর এক হাতে বন্দুক। হাঁ, জলদস্যুর দল, সত্যিকারের ডাকাত ওরা। সেই ভগ্নাবশেষের উপর দিয়ে আজ আমরা এলাম, একশো মাইল ধরে ছড়িয়ে আছে এই দস্যু-দের কীর্তি—মানুষের অস্থির উপরই তার ভিত্তি একদিন গড়ে উঠেছিল।

হাঁ, অস্থির উপরই তার ভিত্তি ছিল বটে, বললাম, কিন্তু আজ তার দিকে তাকিয়ে দেখ, কি সুন্দর প্রান্তর, গৃহপালিত জন্তুর দল চড়ছে, কোথাওবা আঙুরের ক্ষেত, স্তেপ।

হাঁ, হাঁ, আন্দ্রে বলল, তার চোখদুটি জ্বলছে, আমার কথাও তো তাই। চারদিকে সৌন্দর্য আর তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। মানুষের ইতিহাস শুধু যুদ্ধের তালিকা নিয়ে সৃষ্টি হয়নি বলেই তো আজ এ দৃশ্য এত সুন্দর। যদি শুধু যুদ্ধই থাকত, তোমার আমার অস্তিত্ব থাকত না। কিছুই বাঁচতনা। জ্ঞানী, শক্তিমান আর ন্যায়পরায়ণরাই তো সংস্কৃতির জন্ম দেন, আর বাল-বাসের মতো চির অভিশপ্তরাই সে সংস্কৃতি ধ্বংস করে। *

লাল সূর্য জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। এখনো ঝলমলে তার রশ্মি, ঢেউ উঠছে, সারি সারি ঢেউ এগিয়ে আসছে, সূর্যের আলো পড়েছে তার উপর। খানিক পরেই সূর্য আরো নিচে নেমে এল, জ্যোতি আর নেই, এখন তার রং গাঢ় লাল। হাওয়া উঠে এল সমুদ্র থেকে, তাব বিস্তার আছে কিন্তু উদ্দামতা নেই। সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে গেল, সমুদ্র যেন বিছানো চাদর, রং তার ঘন গাঢ় নীল। জল সরবরাহ কেন্দ্রের নিশান উড়তে লাগল হাওয়ায়। ঠাণ্ডা পড়ছে। আন্দ্রে তার কোট খুলে আমার গায়ে পরিয়ে দিল। আমি কোটে সারা গা ঢেকে বসে রইলাম চুপ করে, ঝুঁকে পড়ে ওর কোটে লাগানো লালঝাণ্ডা দেখছিলাম।

এ সম্মান তুমি কি কি করে পেলে?

খালকিনগলের জন্য, সে বলল।

কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম। চুল উড়ছে বাতাসে, নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, চুরি করে আমার আন্দ্রের দিকে একবার তাকালাম। চওড়া কাঁধ, সূর্যের তাপে বুকের একজায়গায় লাল হয়ে গেছে, ওর বরফের মতো সাদা সার্টের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম।

হা ভগবান, আরো যুদ্ধ হবে? জিজ্ঞেস করলাম।

হবে বইকি, সে বলল, আর হয়তো শীগগিরই। কিন্তু সে তো ভয়ংকর ব্যাপার আন্দ্রুইশা, আমি চাইনা সে সর্বনাশ আসুক।

তুমি কি ভাবছ আমিই চাই? না, আমিও চাইনা।

কেউই চায়না।

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, আন্দ্রে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, পৃথিবীতে বহু দস্যু আছে, যাদের আত্মা অলাস টেরেনটিয়াস বালবাসের মতোই নীচ আর লোভী। আমরাই তাদের গলার কাঁটা, তাদের বাধা। তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না যে পৃথিবীতে একদল সুখী স্বাধীন মানুষ থাকবে, যারা অন্যকে উৎপীড়ন, বঞ্চনা, লুণ্ঠন বা হত্যা করার পরিবর্তে ন্যায়কে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। তাই আজ হোক কাল হোক এই অন্ধকারের আত্মারা, এই সয়তানরা ছুরি নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই দস্যুরা মনে করে ওরা আমাদের চাইতে শক্তিমান। এই রোমক সৈনিক বালবাসের আমল থেকে, না তারও আগে কেইনের আমল থেকে, কেউ কেউ ভেবে এসেছে সত্য। বুঝি শক্তির মধ্যেই নিহিত আছে। সয়তান তাদের নিয়ে যাক! তারা ভয়ংকর ভুলই করেছে, সত্য শক্তির ভিতরে নেই, সত্যের ভিতরে আছে শক্তি, আর সেই সত্য আমাদের দিকে, তাই শক্তিও আমাদের। নিনচকা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, একদিন ওরা আমাদের সত্যের শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে।

হাঁ, হাঁ, আন্দ্রে তার হাতের উপর মুষ্টিবদ্ধ হাত চাপড়ে বলল, আমার বন্ধু ভ্যালেরি প্যাভলোভিচ চাকলভ বলেন, আমি আর তুমি কি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছি জানো? আমরা ধ্বংসের গবেষণা চালাচ্ছি। আমাদের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে আকাশ থেকে আমাদের পিছনে যে পশু অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে আছে তাকে ধ্বংস করা। জানো নিনচকা, বহুবার অমি সামরিক বিমান বিভাগে যেতে চেয়েছি, বোমারু বিমানে কাজ করতে চেয়েছি, কিন্তু ওরা আমাকে নেয় নি। আমি কি এত বুড়ো হয়ে গেছি, নিনচকা?

দোহাই তোমার, আমার কাছ থেকে আর চকচকে প্রশংসার কথা

শুনতে চেয়োনা, বললাম। না না, তুমি বুড়ো হবে কেন? তুমি তো যুবা, আর কি চমৎকার তুমি! তাইতো তোমাকে আমি এত ভালবাসি। ওর হাতের আঙুল নিয়ে জোরে চাপ দিলাম। এবার বুঝতে পারছ?

হাঁ, আন্দ্রে হাসল। কিন্তু যুদ্ধ তবু আসবে। নিজের সুখের জন্য লড়তে হবে। আমি কি সৌভাগ্যবান! এমনি জগতে, এমনি জীবনে তোমার দেখা পেলাম।

সূর্য দিকচক্র স্পর্শ করেছে, ম্লান লালে ভরে গেছে চারদিক। সূর্য আঁধার হাওয়ার উদ্দাম সমুদ্রে ডুবল। কিছুক্ষণ পরে জলের উপর জেগে রইল সূর্যের এক টুকরো, জলন্ত একখণ্ড কয়লার মতোই দেখাচ্ছে। দূরে কামানের গর্জন। জলন্ত কয়লার টুকরো সমুদ্রে ডুবে গেল। আঁধার মাস্তলের ডগায় ডগায় ছোট ছোট হলদে লণ্ঠন জলে উঠল একটি একটি করে।

এবার চল, আন্দ্রে বলল।

আমরা উঠে হাত ধরে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলাম।

[উনিশ]

চৌঠা জুলাই সেই শোকের দিনে আমাকে পেয়ে বসল এই স্মৃতি। সিবাস্তপুল, আমাদের প্রেমের শহরের পতন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তবু সহ্য করলাম। জীবন মৃত্যুর চাইতে ঢের বড় হয়ে দেখা দিল, জীবন জয়ী হোল।

নিনা পেত্রোভনা চুপ করলেন। চারদিক নিস্তব্ধ, চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়ছে, মেঘে ঢাকছে আকাশ। অন্ধকার আরো গভীর হয়ে এল। অফিস-বাস থেকে টাইপরাইটারের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছেনা। একটা

ভ্রাম্যমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ-কেন্দ্রের অস্তিত্ব টের পেলাম কিছু দূরে।

ধোঁয়াটে নীল আলোর স্তম্ভ পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। একজন সান্ত্রী এল আমাদের কাছে। জার্মানরা ওপর থেকে সন্ধানী আলো ফেলছে, সে বলল।

কত কাছে বলে মনে হচ্ছে! নিনা পেত্রভনা বললেন, মনে হয় যেন হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়।

সান্ত্রী কিছুক্ষণ রইল, তারপর হাই তুলে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলল, ঐ শূয়োরগুলো আজকের মতো ওরেলে বসে সন্ধানী আলো ফেলুক, আজই ওদের শেষ রাত, কাল ওরা টের পাবে।

কর্নেল বাস থেকে নেমে এলেন, জোব্বাটা তার হাতে, একটা বিজলী লণ্ঠন নিয়ে পথ দেখে দেখে আমাদের কাছে এলেন।

এখনো ঘুমোন নি?

না কমরেড কর্নেল, আমরা কথা বলছিলাম, নিনা পেত্রভনা বললেন।

না, না, এখন কথা নয়, ঘুম, কর্নেল বললেন। নিনা পেত্রভনা, আপনার বোধহয় খুব ঠাণ্ডা লাগছে, তাই ঘুমোতে পারছেন না। আমার জোব্বাটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন।

কর্নেল কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, হাই তুললেন তিনি। তারপর বললেন, মস্কোর খবর কি? আপনারা তো আমাকে আর্ট থিয়েটার ফিরে এসেছে কিনা সে কথা বলেন নি।

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চুপ করে গেলাম। অন্ধকারের ভিতর থেকে এক সাজোয়া গাড়ি বেরিয়ে এল। একজন সৈন্য ছাদের ওপর বসেছিল, গাড়ি থেমে যেতেই, সে লাফিয়ে পড়ে কর্নেলের কাছে এসে ভাঙা গলায় বলল। তার 'র' উচ্চারণে কেমন একটা টান।

কমরেড কর্নেল, কোর-কমাণ্ডারের কাছ থেকে একটা জরুরী বাণ্ডিল এসেছে।

সে খবরাখবর দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। কর্নেল প্যাকেট খুলে লণ্ঠনের আলোয় পড়লেন। ঠিক আছে।

উত্তর দেবেন না ?

তাকে বোলো, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওরা বিশ মিনিট আগে চলে গেছে।

কর্মচারীটি কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

জেনারেল কোথায় ?

বাঁকের মুখে। তাকে বলবে, সাঙ্কেতিক ভাষায় এক জরুরী খবর আছে।

হাঁ, বলব, এখন যেতে পারি ?

হাঁ।

কর্মচারীটি সাজোয়া গাড়িতে লাফিয়ে উঠে আবার হুকুম দিলেন : বাঁকের মুখে। তার স্বর তেমনি ভাঙা আর ছেলেমানষি আমেজ সে স্বরে।

গাড়ি ঘুরে তখনি মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল খুদে গাট্টাগোট্টা কর্মচারীটি অন্ধকারে। তখনো ধোঁয়া উঠছে ঘাসের ভিতর থেকে, কর্নেল বাসে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন। আবার টাইপরাইটারের খট খট শব্দ উঠলো। জার্মান সন্ধানী আলো আকাশে ঘুরছে। হঠাৎ নিবে গেল আলো, মনে হোল কে যেন একটা টুপি ছুঁড়ে ঢেকে দিয়েছে আলো। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।

নিনা পেত্রভনা কর্নেলের জোব্বাটা নিয়ে মুড়ি দিয়ে আবার তার কাহিনী শুরু করলেন।

কারখানার কোনো পরিবর্তন হোলনা, তিনি বললেন, দেখে মনে হোত রুটিন-মাফিক কাজ চলছে, কিন্তু এরই ভিতর কিছু কিছু পরীক্ষা আমরা

চালাচ্ছিলাম।

যেমন, জোসিয়াকে তিন তিনটে বেঞ্চে একা কাজ করতে দিলাম, সে কাজও করল বটে। খুদে লাল ঝাণ্ডা আবার মুশিয়ার কাছ থেকে তার কাছে ফিরে এল। জোসিয়া এক ভীষণ দিব্যি করল যে, ও ঝাণ্ডা আর মুশিয়া কখনো ফিরে পাবে না।

মুশিয়া ঠোঁট চেপে উপেক্ষা করবার ভাণ করল, কিন্তু নাক তখন তার লাল হয়ে উঠেছে, চোখে চক চক করছে জল। সেও কাঁধ নেড়ে বলল, আচ্ছা, দেখা যাবে।

আমারও দিনের বেশির ভাগ সময়ই কারখানায় কাটত, খুব নিঃসঙ্গ লাগতনা। জিনা মাসী আমাকে শিখিয়ে দিলেন, কি করে দুঃখ সহ্য করতে হয়। মাঝে মাঝে পেতিয়ার কাছ থেকে চিঠি পেতাম। সে সীমান্তের বর্ণনা করত, অতীতের কথা লিখত, আমি উত্তরে কারখানার কথা লিখ-তাম। মাঝে মাঝে থাকত অতীতের উল্লেখ। একবছর আগে অক্টোবরে আমাদের কারখানা এই মধ্য ভলগা এলাকায় বসেছে, আমি একবছর এখানে কাজ করছি। দ্বিতীয়বার শীত এল। সোভিয়েট ইউনিয়নের একটা মানচিত্র আমাদের কারখানার অফিসের দেয়ালে টাঙানো ছিল। দেখতেও ভয় লাগত মানচিত্রখানাকে। আগের বছরের থেকে এবার পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর।

প্রতি লোকের মুখে স্তালিনগ্রাদের কথা। স্তালিনগ্রাদের নামে সবাই গর্ব আর ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠছে, ঠিক সিবাস্তপুলের বেলায় যেমনটি হয়েছিল।

কারখানার ব্যাপারে মিক্ক গিয়েছিলো স্তালিনগ্রাদে, পায়ে আর কাঁধে আহত হয়ে সে ফিরে এল। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাধা, সে লাঠি ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কারখানায় এল। না এসে উপায় কি, তার কত কাজ!

দালালরা তাকে ঘিরে আছে সারাক্ষণ।

সে এরই ভিতরে এক মিনিট সময় করে আমাকে শোনাল তার অভিজ্ঞতা।

নিনচকা, চোখ মিট মিট করে সে বলল, এখানে আর আমাকে দেখতে পেতেনা। সে এক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু ধাতুর পাতগুলো ঠিক দু'জাহাজ বোঝাই করে ফেললাম। কি করে যে করলাম কল্পনাও করতে পারবে না।

কেন, বোঝাই করতে খুব কষ্ট হোল বুঝি?

সে এক কাহিনী, এখন লোকগুলো সব খাঁটি সোনা হয়ে গেছে, আমরা সাহায্য ছাড়াই মাল বোঝাই করে ফেললাম। এই তো আমিই টনখানেক মাল নিয়ে গেলাম। আমার ধূসর রঙের চামড়ার ওভারকোটটা দেখেছ? তখন তো নতুনই ছিল, আজ তার কটা ছেঁড়া টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই। জার্মানরা প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বন্দরের উপর হানা দিয়ে বোমা ফেলছিল। এক কথায় এ এক দুঃস্বপ্ন। দেখছ তো, আমার কি হাল করেছে! তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে হাড়গুলো ভেঙে যায়নি। কিন্তু কথাটা তা নয়। ওরা আমাদের ভালো ইস্পাত দিলেনা, ওদের নিজেদের নাকি দরকার। তোমাদের কি দরকার বাপু?—তোমাদের কারখানার যন্ত্রপাতি তো অর্ধেকের বেশি অন্য জায়গায় চালান করে দিয়েছ, বললাম। ওরা উত্তর দিল: তাতে কি হয়েছে! আমাদের ইস্পাত দিয়ে অনেক কাজ। জানো নিনচকা, আমি কমিসারিয়েটে তার করে তাদের হুকুমনামা আনিয়ে যখন দেখালাম তখন কিছু পেলাম বটে। ওঃ! সে এক মহাকাব্য আর কি।

শহরের কি হোল? জিজ্ঞেস করলাম।

শহর? জ্বলছে। আকাশ কালো হয়ে আছে জার্মান বিমানে। সে

এক ভয়ংকর দৃশ্য।

জার্মানরা দখল করতে পারবে ?

স্তালিনগ্রাদের কথা বলছ ? নিনচকা, নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছ।
মিস্ক চিৎকার করে উঠল : স্তালিনগ্রাদ দখল করবে ? সে ক্ষেপে গেল।
তারা এই পাবে। সে আঙুল দেখিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল।

পরমুহূর্তেই তার স্বর শুনতে পেলাম দূরে, চিৎকার করে বলছে, কি ?
না, না, এক রত্তিও না ! আমাকে মেরে ফেলে যদি নিতে পার ! না,
না, ডিসেম্বরের আগে এক রত্তিও দিতে পারব না।

বিমান হানার সংকেত তখন ঘন ঘন শুনছিলাম। জার্মান হানাদার
বোমারু বিমান দক্ষিণ থেকে শহরের উপর আসছে, বড় বড় সন্ধানী
আলোর রশ্মি নিষ্প্রদীপ কারখানার উপরের ধূম্র আকাশে মেঘের ভিতরে
খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাজ থামল না। ছাদ থেকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট
গান গুলী চালাত, আকাশ ভরে যেত তারই লাল স্ফুলিঙ্গে।

বাড়ির ছাদ আর শহরের সাঁকোগুলো ভরে যেত সাদা বরফে। ভোর
যেন আঁধার নিয়েই দেখা দিত। ভলগার উপর ভাসত তেল। আর বছরের
মতোই জাহাজের সিটি শোনা যেত। আশ্রয়প্রার্থী নরনারী নিয়ে
স্তালিনগ্রাদ থেকে আসত জাহাজ। ঠাণ্ডা পুবাল বাতাস মাঝে মাঝে
আবর্জনা আর ধুলো ছড়িয়ে যেত ট্রাম লাইনের উপর। ট্রামগুলো মোড়
ঘুরতো শব্দ করে। মোড়ে মোড়ে লাউডস্পীকারের কাছে কনকনে হাওয়ার
দিকে পিঠ ফিরিয়ে ভিড় জমে উঠত, ভোরবেলা খবরের চুম্বক শুনবার
জন্যেই তারা ছুটে আসত।

কেউ এসে হয়তো জিজ্ঞেস করত : এখনো আছে ?

হাঁ, এখনো আছে, ভিড় থেকে উত্তর আসত। খবর শেষ, ভিড় সরে
যেত। লোকগুলো ছুটে চলছে, হাত তাদের পকেটে, মাথা নুয়ে চলেছে।

তবু বাতাস এসে মুখেচোখে লাগছে, লাগছে ধুলো।

স্তালিনগ্রাদ আমাদের গৌরবের প্রতীক, আমাদের স্তালিনের শহর। রুশরা তো তাকে জার্মানদের কলুষিত করতে দেবে না।

হাঁ, তারা তা দিলও না।

[কুড়ি]

ডিসেম্বরের শেষে দীর্ঘ নীরবতার পরে পেতিয়া নিজে এসে দেখা দিল। আবার বিমান সম্পর্কে বন্দোবস্ত করতেই সে এল। ভারি ব্যস্ত সে। আমার সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটাল, ভোর বেলায় চলে গেল সীমান্তে।

এই ক্ষণিকের দেখায়ও খুশি হলাম। জার্মানদের আমরা স্তালিনগ্রাদে পরাজিত করেছি, তারা বাধ্য হয়ে পেছু হটছে। এবার আবার আন্দ্রের কবর দেখার আশা।

মানচিত্রখানা আগে দেখতে ভয় লাগত, কিন্তু এখন যেন চুম্বকের মতো সে আকর্ষণ করতে লাগল। চোখ আর ফেরানো যায় না। লাউড-স্পীকারের কাছে সবসময়েই ভিড়। সবাই কান পেতে শুনছে আমাদের বিজয়ের স্তোত্র।

সব-কিছু এখন চমৎকার লাগছে। শীতও যেন অনুকূল। খুব বরফ পড়ছে, তুষার-ঝড় শুরু হয়েছে। ক্ষ্যাপা হাওয়া শুকনো বরফের মেঘ উড়িয়ে আসছে ভলগা থেকে। কারখানার উঠোনে মানুষের বুক-সমান জমে উঠেছে বরফের স্তূপ। কোথাও-বা পিচের রাস্তায় জমা বরফ হাওয়ায় ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে।

সাদা কুয়াশা ভলগার উপরে। লোকে বলছে: চমৎকার, ঠিক এমনটিই তো দরকার। আরো খারাপ হয়ে উঠুক। জার্মানরা এবার ডনের উপর

নাচুক না দেখি!

যখন মেঘ ক্ষণিকের জন্ম সরে যেত উত্তাপহীন তুষারাবৃত সূর্য তারা শহর ভলগা আর ওপারের বন রেখা আলো করে তুলত, নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠত তুষার। মনে হোত এ যেন এক স্বপ্নের রাজ্য, এর তো বর্ণনার ভাষা মেলে না।

ঠিক এমনি দিনে এল পেতিয়া। তাকে আশা করিনি। চিঠিতে ঘুণাক্ষরেও সে আসার সম্ভাবনার কথা জানায়নি। ভারি খুশি ছিল মনটা, আমরা জয়ী হয়েছি, কারখানার কাজ বেশ চলছে। আমরা পিপল্‌স্‌ কমিসারিয়েট থেকে পেয়েছি সম্মানসূচক প্রতিরোধ নিশান। গুণানুসারেই দেওয়া হয় এই সম্মান, তাছাড়া আবহাওয়াও চমৎকার।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম। ভাবলাম একা একা খানিকটা ঘুরে আসব, অনেকদিন এমনি একা থাকার তাগিদ অনুভব করিনি।

সূর্য তখন সবে ডুবছে, পশ্চিম আকাশ শীতল নীল, তারই উপরে রঙের সমারোহ। কোনটা-বা গোলাপী, কোনটা-বা লেবুর মতো হলদে, কোনটা-বা সবুজ—উজ্জলতা আছে কিন্তু দাহ নেই। তবু দেখে কেমন যেন ভয় লাগে। সবকিছু বরফে ঢাকা, ছেলেমেয়েরা কোথাও-বা বরফের স্তূপ তৈরী করে ঝাপ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সব-কিছুর উপর পড়েছে ডুবন্ত সূর্যের আলো, সোনার পাতের মতো ঝলসে উঠছে।

গোল পার্কে লেনিনের মূর্তির কাছে একটা পাইন গাছ পোঁতা হয়েছে নববর্ষের উৎসবে। সব-কিছুর ভিতরেই উদ্দীপনা, সেদিনের সবকিছুই মনে আছে, খুঁটিনাটিটুকুও।

লম্বা কুইবিশেভ ষ্ট্রীট দিয়ে চললাম, গ্র্যাণ্ডহোটেল ছাড়িয়ে গেলাম। চমৎকার গাড়ির সার দাঁড়িয়ে আছে। বরফে ঢেকে গেছে গাড়িগুলো, শুধু বিদেশী নিশানগুলো দেখা যাচ্ছে।

ওয়া এল, আমার কান জমে গেল, গাল আপেলের মতো শক্ত
পথের মোড়ে মোড়ে হাওয়া ভীষণভাবে বইছে, আর আমার
রিক কোটপরা মেয়েরা দ্রুত ছুটছে। তাদের নীল চোখ, আর
বরফে সাদা চুলের দু'এক গুচ্ছ শুধু কোটের ভিতর দিয়ে
আমিও ছুটলাম। জেটি থেকে আসছে এক সার মালগাড়ি,
কাপড়ে ঢাকা, তার উপরে বরফ জমে উঠেছে, নাক
য়া, হাওয়ায় সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে তুলোর মতো।
কষ্টে এগিয়ে চললাম, কাঁধ দিয়ে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা
র শক্তি। নিশ্বাস পর্যন্ত নিইনি। বাড়ি এসে পৌছলাম তাড়া-
কের কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বরফ দিয়ে গড়িয়ে
এক স্লাইড তৈরী করেছিল। হঠাৎ কেমন যেন ছেলেমানষি
আমি ছুটে গিয়ে স্লাইডে পা দিলাম, গড়িয়ে চললাম। এক-
ওয়া চামড়ার কোট আর বুট-পরা বিমান-বিভাগের লোক
ফটকের ছোট্ট দরজাটা খুলছিল, প্রায় তারই গায়ের উপর
আর কি। ধাক্কা লাগতই, কিন্তু আমি শক্ত করে দুহাত দিয়ে
চেপে ধরলাম।

সে পেতিয়া। সে এত হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে তার অপ্রতিভভাব চেপে রাখতে পারল না। তার পরনে ধূসর রঙের কুকুরের চামড়ার কোট, মুখ-খানার চামড়া এখানে ওখানে ফেটে গেছে, শুধু কোটের কলার বরফে-সাদা। আমি লজ্জিত হলাম না, বরং খুশি হলাম ওকে দেখে।

বহুদিন হোল এসেছ? বেশিদিন থাকবে? তার হাত ধরে বললাম, তোমাকে দেখে যে কি খুশি হয়েছি, কি বলব। চল ভিতরে যাই।

আজই এসেছি, কাল চলে যাচ্ছি।

স্তালিনগ্রাদ থেকে এলে?

হাঁ, সেখানেও ছিলাম।

তোমাকে একেবারে অন্যরকম মনে হচ্ছে। ভারি ক্লান্ত যেন।

হাঁ, তা বটে, সে হাসল। তার বাদামী রঙের চোখে দুষ্টুমীর আলো ঝলসে উঠল।

সীমান্তের খবর কি?

আমাদের পক্ষে মন্দ নয়, তবে জার্মানদের পক্ষে ভালো নয়। তার গলার স্বর ঠাণ্ডায় ভেঙে গেছে।

ওকে চা দিলাম। পর পর দু'কাপ চা খেয়ে চাঙা হয়ে কথা বলতে শুরু করল। জিনাইদা কনস্তান্তিনোভনা দোসরা পালা কাজে গিয়েছেন। আমরা একা। ও যখন চা খাচ্ছিল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। শেষবার যা দেখেছি, তার থেকে ঢের বদলে গেছে। তার কপালের চুলে পাক ধরবার কথা ছেড়েই দিলাম, মুখখানাই বদলে গেছে। বুড়িয়ে যায়নি, এসেছে পরিপূর্ণতা, গাম্ভীর্য। এক সময় দুষ্টুমির ছোপ ছিল সারা মুখে, এখনো সয়তানিটুকু আছে বৈকি। কিন্তু গাম্ভীর্যে চাপা পড়ে গেছে, কেমন একটা নিষ্ঠুরতা দেখা দিয়েছে। চোখ একটু ট্যারা, চোখের কোলে দাগ পড়েছে, দাগ পড়েছে কপালে, নাকের উপরে একটা দাগ পড়েছে, অস্ত্রের মতো ওকে দেখাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যায় মানুষের পক্ষে যুদ্ধটা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

আঁধার হয়ে এল, ইলেকট্রিক স্টোভের অগ্নিবর্ণ জড়ানো তারগুলো ঝলসাচ্ছে। কাগজের ঢাকনাটা টেনে দিয়ে আলো জাললাম। কালো আচ্ছাদনের আড়ালে শ্বাসরুদ্ধ আলো চিকমিক করে উঠল। আবার অস্ত্রের কথা শুরু করলাম, পেতিয়ার সেই প্রথম সাক্ষাতের সময় যেমনটি করেছিলাম। বহুক্ষণ কথা হোল, তারপর একসময় হঠাৎ থেমে গেল কথা। চুপ করে বসে রইলাম।

শোনো, নিনা পেত্রভ্না, হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলল পেতিয়া, অপেরায় যাবে নাকি চল? এখানে এখন তো বলশয় একাডেমি থিয়েটার রয়েছে, সে বিনীতভাবে বলল, দেশের সেরা থিয়েটার। এই দেখার সুযোগ। জানো, সীমান্তে সৈনিকদের কাছে বলশয় থিয়েটারের অভিনয় দেখা এক বড় বড় স্বপ্ন।

থিয়েটারে যেতে আমার ইচ্ছে ছিল না। অভ্যেস নেই, তাগিদও বহুদিন অনুভব করিনি। কিন্তু এই আনন্দ থেকে ওকে বঞ্চিত করা তো নিষ্ঠুরতা। ও তো একদিনের জন্য এসেছে সীমান্ত থেকে। পোশাক বদলে সংস্কৃতি সৌধে চললাম, ওখানেই সাময়িকভাবে বলশয় থিয়েটার অভিনয় করছে। আবহাওয়া বদলে গেছে। বরফ পড়ছে।

পেতিয়া ছুটে গেল টিকিটঘরে, কিন্তু খুব হতাশ হয়েই সে ফিরল। সোমবারে কোনো অভিনয় নেই। আজ সাস্তাকোভিচের সপ্তম সিম্ফনী হবে।

চমৎকার! চিৎকার করে উঠলাম, আমরা বাজনাই শুনব।

সারা সন্ধ্যে বসে বাজনা শুনব! অভিনয় দেখতে পেলাম না, সে দুঃখ করে বলল, না, বরাতে নেই, নিনচ্কা। এখন কি করব?

বাজনা শোনা ছাড়া উপায় ছিলনা। পেতিয়া টিকিট কাটল।

[একুশ]

অর্কেস্ট্রার প্রথম সুর আমাকে আমার চিরাভ্যস্ত স্মৃতির রাজ্যে নিয়ে গেল, ডুবিয়ে দিল।

আপনি বোধহয় সাস্তাকোভিচের সপ্তম সিম্ফনী শুনেছেন।

প্রথম মুখটা শুনতে শুনতে কল্পনায় ভেসে এল সেই উষ্ণ কুয়াশাময়

সকাল। যেন আমি মস্কোর শহরগুলির স্বাস্থ্যাবাসগুলির ভিতরে ঘুরছি। ভুসিয়া আসবে বারোটার গাড়িতে। আমার মন উৎফুল্ল, স্বাধীন। ভবিষ্যৎ আমার উজ্জ্বল।

আমাদের পরিবার গ্রীষ্মকালটা কখনো শহরে কাটাতনা। একজন চাষীর কাছ থেকে আমরা একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে সেপ্টেম্বর মাস অবধি কাটাতাম। মা গ্রামেই থাকতেন সারা সময়, আমি আর বাবা ব্যস্ত লোক, তাই আমরা সময় পেলে সেখানে যেতাম, প্রতি সপ্তাহের শেষে একবার যেতেই হোত।

আন্দ্রে আর আমার তখন বিয়ে হয়েছে, তবু আলাদা আছি। মস্কোতে তার ফ্লাট ছিলনা, তাছাড়া, উত্তরেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হোত, তখন সে সেই বিখ্যাত আর্কটিক অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছে। তাই সিবাস্তপুলের সেই মিলনের পর তাকে খুব কমই কাছে পেতাম, যা-ও আসতো, বেশিদিন থাকত না। সে কথা দিয়েছিল এবার গ্রীষ্মে, জুন মাসের শেষে সে এসে আমাদের সঙ্গে আগস্ট পর্যন্ত থাকবে। শীতে বে-সামরিক বিমানবাহিনীর বিল্ডিংএ আমরা একটা বড় ফ্লাট নিয়ে সংসার পেতে বসবো।

আন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করে আমি ক্লান্ত হই না। আমরা দুজনে দুজনকে এত ভালবাসতাম, সুমুখে দুজনের সুখের জীবন, তাই মনে হোত, একদিন আগে পিছে হলে তাতে তো কিছু যায় আসে না। তাছাড়া প্রতীক্ষারও তো একটা আনন্দ আছে।

হ্যাঁ, চিঠি লিখতাম বইকি। কিন্তু আন্দ্রে তার এখানে পৌছানোর তারিখ লিখতনা। তার আনন্দোচ্ছল চিঠিগুলো পড়ে যে ইঙ্গিত পেতাম, তাতে মনে হোত, হঠাৎ এসে হাজির হয়ে আমাকে অবাক করে দিতে চায়। রোজ তার জন্য পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেদিনও ভুসিয়ার জন্য

স্টেশনে যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চিত ছিলাম, আজ সে আসবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম; পথে দেখা হবে এই আশায়। তারপর দুজনে একসঙ্গে চলার আনন্দ তো আছেই! তাই স্টেশনে যাওয়ার সবচাইতে দীর্ঘ পথটা বেছে নিলাম।

পাইন বনের ভিতরের পথ ধরে চললাম। চারদিক শান্ত, কেমন ছায়াঘন। পাইনের গন্ধ আসছে, চারদিকের ঘন সবুজ রং কেমন এক নীলচে কুয়াশা সৃষ্টি করেছে চারদিকে। ছুটির দিনে মস্কো থেকে এখানে বহু লোক ফুর্তি করতে আসে। ঝোপের আড়ালে পাইনের খোসার ভিতরে গুঞ্জন শোনা যায়, গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে ঘুরে বেড়ায় প্রতিধ্বনি। সেদিন কিন্তু সব চুপচাপ, শুধু কুয়াশা ফোঁটা ফোঁটা টুপটাপ করে ঝরছিল। আমি এমনি নিস্তব্ধতাই আশা করেছিলাম, তবু এরই ভিতরে ছিল যেন কেমন এক অশুভ ইঙ্গিত।

প্রশস্ত মস্কো মিনস্ক সড়ক পার হয়ে গেলাম। রাতের বর্ষায় মসৃণ পথ ধোয়া, লোহার মতই নীল দ্যুতি ঝলসে উঠছে। বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পথ, পাশে পাশে সাদা পোস্ট। একটি হালকা ট্রাক মিনস্কের দিকে চলে গেল, ট্রাকে অফিসের আসবাবপত্র আর বিছানা। লালফৌজের সৈনিকরা বসে আছে বর্ষার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সবুজ ক্যাম্বিজের ঢাকনি আসবাবের উপর। ওরা ছাউনিতে যাচ্ছে বোধ হয়, মনে হোল, কিন্তু এখন তো সে সময় নয়। কেমন অস্বস্তি লাগল।

কিছুদূরে আর একটি বন, আগেরটির মতো সুন্দর নয়। ছাড়া ছাড়া হলদে পাইন গাছ, রিক্ত শাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন অনুর্বর পাইন গাছের সার কেমিক্যাল কারখানার কাছে প্রায়ই দেখা যায়। জমিতে একটু ঘাস নেই, শুধু ধূলো উড়ছে। এমনি পাইন বন এই প্রথম দেখলাম।

দুই বুড়ি মাথায় রুমাল বেঁধে ছুটে চলেছে, আর হোঁচট খাচ্ছে। তারা

বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, আর ছুটছে, ঘন ঘন দুলছে তাদের হাতের ঝোড়া। একে তো ন্যাড়া পাইন বন, তার উপরে তাদের রকম সকম দেখে আমার অশান্তি বেড়ে গেল, অর্কেস্ট্রার ভিতরে হঠাৎ তাল কেটে কোন একটা যন্ত্র বেজে উঠলে যেমনটি হয়। এই অশান্তি কাটাবার জন্য, আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। এবার এসে পড়লাম পুরনো এক হ্রদের পারে, চারদিকে তার পার্ক। বহু শতাব্দীর পুরনো বলেই মনে হয়। গাছের রূপোলী নীল আবছা ছায়া পড়েছে শান্ত জলে। দুটি সাদা হাঁস, চুনির মতো নীলাভ মাঠের ভিতর দিয়ে পথ করে চলেছে। ভারি চমৎকার লাগল। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশান্তিও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

ঐক্যতানের স্থর কেটে গেল।

দূরে মাচুরিনস্কি গ্রামে বোধ হয় একটা বেতার চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ; কেমন গোলমালের শব্দ। আমি হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম স্টেশনে। প্লাটফর্ম নির্জন। বন্ধ খবরের কাগজের অফিসের কিয়স্কের স্থমুখে জন ছয়েক লোক জটলা করছে। আস্তে আস্তে তারা কথা কইছে।

আমি কাছে যেতেই তারা চুপ করল। তাদের এই চঞ্চলতা দেখে মনে হোল, কি যেন তারা চেপে রাখতে চাইছে আমার কাছ থেকে। আমি তাদের কাছে একটু দাঁড়িয়ে চলে গেলাম আর একধারে। আবার তারা কি বলাবলি করছে। কতগুলো শহরের নাম শুনলাম— ওদেশা, কিয়েভ্ কিশিনেভ্। আমার চেতনার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল নামগুলো। তারপর যখন সিবাস্তপুলের নাম শুনলাম, এক ভীষণ সন্দেহ আমাকে অভিভূত করে ফেলল।

ছুটির দিনের যাত্রী নিয়ে একখানা ট্রেণ মস্কোর দিকে ছুটে গেল, থামল না স্টেশনে। তাতে অস্বাভাবিক কিছু মনে হোল না। সব ট্রেণ এ স্টেশনে থামে না। তবে একটা খুব অস্বাভাবিক লাগল, সকালের

মস্কোর ট্রেণ একরকম ফাঁকাই থাকে, আজ দেখলাম একেবারে ভর্তি।

আমার পরিচিত একজন ইঞ্জিনিয়ার, তার স্ত্রী আর ছোট ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলেছেন। তাদের দেখে কিন্তু ছুটির দিনে বেড়াতে চলেছেন বলে মনে হয় না। তারা প্লাটফর্মের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছোট ছেলেটির কাঁধে একটা সবুজ থলে।

ব্যাপার কি বলুন তো? তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে কি! কিছুই শোনেন নি, ছোট ছেলেটি যেন তিরস্কার করে উঠল। আমি ছেলেটির মার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম। চোখের সামনে নিষ্প্রাণ যুদ্ধক্ষেত্র দেখা দিল। হাজার মাইল ধরে তার একঘেয়ে বিস্তৃতি—

খুদে খেলনার দামামা ঘোষকরা এক দুই তিনজন করে আবছা দিগন্তের পিছনে যেন মার্চ করে চলেছে, দামামা বাজছে।

বুঝতে পারলাম, ট্রেণে কেউ আসবে না, যে জীবনের ছক কেটে রেখেছিলাম, সে-জীবন চলে গেছে। দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম। মা জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন। সেইদিনই ফিরলাম মস্কোতে।

পথে শুধু মনে হোল, সেই বাজনা শুনছি, চলেছে তো চলেছেই, মাঝে তাল কেটে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, আলো-আঁধারে অন্ধকার সিঁড়িতে মানুষের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

শহরের বাইরে যুদ্ধের মরুভূমি ধূ ধূ করছে। সিঁড়ি দিয়ে নামলেই দেখা যাবে বালির বাক্সের সার। চিলেকোঠায় ঝোলানো রয়েছে মস্ত বড় বড় চিমটে আর সাঁড়াশি। গোর্কি ষ্ট্রীটের নতুন দোকানের সারের জানলায় জানলায় বালির বস্তা। প্লেগের মতো যুদ্ধ প্রতি বাড়ির আর্শিতে সাদা ক্রুশ চিহ্ন দেগে দিয়ে গেছে।

রাতে নিষ্প্রদীপ মস্কো কত সুন্দর আর মহান! নতুন সেতুর সার

তাদের উপরের প্রকাণ্ড খিলানগুলি যেন দুলছে জলের উপরে, পুরনো টাওয়ার আর করাতের মতো খাঁজকাটা দেওয়ালের সার, ক্রেমলিন—সব কিছু রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাত গাঢ় হয়ে আসছে, নিষ্প্রদীপ পথে পথে ঝুলের মতো। ছাদের উপরে উঁচুতে নীলাভ জুলাই আকাশের দ্যুতির পটভূমিকায় অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্ট কামানের ছায়া ফুটে উঠেছে, সতর্ক পর্যবেক্ষকরা দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম দিক চেয়ে। ভূতের মতো প্রতিরোধকারী বেলুনের সার উঠল আকাশে। সাদা জন্তুর দল। সুতো ঝুলছে, তারা উঠতে লাগল, শেষ আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল নিষ্প্রভ নক্ষত্রের সঙ্গে। এরাই হচ্ছে বিমান হানার সংকেতের বিষাক্ত বীজ, সাদা চোখে এদের দেখা যায় না।

খুদে দামামা-বাদকরা চলেছে, যন্ত্রের ধ্বনি, ক্ষেপা বাঁশির সুর শেয়ালের মতো বালির ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে চলেছে, বারে বারে পেছু হটছে, হঠাৎ বেজে উঠল হতাশার চিৎকার। উচ্চস্বর, বিকৃত, ছলনাময়। অন্ধকার শহরের উপর উঠে এল, আবার মিলিয়ে গেল।

ভোরে, বিনিদ্র রাতের গলিঘুঁজী থেকে পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে এল, সবাই বাড়ি ফিরছে, যুদ্ধের মরুভূমি থেকে ফুটপাতের উপর ছড়িয়ে পড়ছে উত্তপ্ত বালুকা, পায়ে লাগছে। জলন্ত সূর্য উঠছে, কেমন যেন ঘুঘু রঙের ওড়না ঢাকা।

চলেছে খুদে দামামাবাদকের দল, বাজছে দামামা আরো জোরে। এবার দামামার ধ্বনি এসে মিলল ভীষণ চিৎকারে। তারা নিয়ে চলেছে কালো ক্রুশ-আঁকা ঝাণ্ডা আর সাদা ক্রুশ-আঁকা কালো ট্যাঙ্কের সার। আজ দিগন্তের আড়াল থেকে তারা বেরিয়ে এল। ভস্মীভূত নগরীর আর অগ্নিশিখার ভিতর দিয়ে চলেছে যুদ্ধযন্ত্র, আস্তে আস্তে চলেছে। বর্ণহীন আকাশ মৃত্যুর নিশ্বাস ফেলছে এই দিগন্তের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা কৃষ্ণ

সৈন্যবাহিনীর উপর। ক্যাপটেন গ্যাস্তেলো, অগ্নিশিখায় আবৃত হয়ে, আলোর আত্মার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শত্রুর সাদা ক্রুশ-আঁকা কালো ট্যাঙ্ক-বাহিনীর ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

গৌরব আর মৃত্যু সমর-অরণ্যে তাদের বিরাট স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলল, মৃত্যু আন্দ্রেকে পৌঁছে দিল এক কালো ব্রোঞ্জের দরজায়—দরজা খুলে গেল। আমি আন্দ্রের বোজা চোখে তার চুল আর গন্ধক চূর্ণ মেশানো ঠোঁটে চুমু খেলাম।

নিশ্বাসও যেন ফুরিয়ে এল। খুদে বাদকরা তবু চলেছে, অশুভ তাদের যাত্রা, একঘেয়ে তাদের দামামার সুর। কখনো কখনো যাত্রাপথে ধুলোর ঝড় এসে ঢেকে দিচ্ছে, দামামার শব্দ ঢেকে যাচ্ছে। সেই সংক্ষুব্ধ সুরে পশ্চাৎ-অপসরণের ইঙ্গিত। হঠাৎ সুর থেমে গেল, মাটির উপরে নিচু হয়ে ঝুলছে, আবার দামামা বেজে উঠল।

একমুহূর্তের ছেদ, তারপর প্রশংসার ঘূর্ণী হাওয়া। স্বপ্ন ভাঙল, যেন গভীর ঘুম থেকে উঠেছি, তাকালাম বিরাট প্রেক্ষাগৃহ আর রঙমঞ্চের উপরে। ছোট ছোট দাঁড়ে ভরে গেছে মঞ্চ, উত্তেজিত পরিচালক তার কপালের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে নুয়ে পড়ে অভিবাদন করছেন, তার চওড়া কড়া ইস্ত্রি-করা সার্টের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রক কোটের এক দিকে সম্মানচিহ্ন-আঁকা সরকারী বক্সে তাওয়ারিশ ভিশিনিস্কি মখমলের গদি-আঁটা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

পেতিয়া চুপ করে বসে আছে আমার পাশে, তার চোখ ঝাপসা। অর্কেস্ট্রা আর বাজছে না, কিন্তু তবু মনে হোল এখনো বাজনা চলেছে, ফাটল-ধরা ভাসমান বরফের স্তরের উপর দিয়ে চলেছে খুদে চাকীর দল, প্রতি পদে থামছে, পড়ে যাচ্ছে।

পেতিয়া হঠাৎ উঠে পড়তে ইঙ্গিত করল, চল বাইরে গিয়ে সিগারেট

যাই। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বাইরে যাওয়ার পথের দিকে এগিয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম সে তার চোখের জল আমাকে দেখাতে চায় না। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আর একবার মঞ্চের দিকে তাকালাম। রোগা প্যাণ্টপরা এক যুবক বেহালাদারদের সঙ্গে করমর্দন করছেন, কোটের কলার তার দোমড়ানো। ইনিই সাস্তাকোভিচ।

নিচতলার প্রশস্ত বারান্দায় এসে পৌঁছলাম। পেতিয়া ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়েছে। সে পাইপ ধরাল। আন্দ্রের পাইপ, বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাকে দিয়েছিলাম।

কৃত্রিম মর্মরের এক চতুষ্কোণ স্তম্ভের কাছে দাঁড়ালাম আমরা। স্তম্ভের রং সমুদ্রের জলের মতো। আমাদের আসে পাশে লোকজন ঘুরছে। ইংরেজ আর মার্কিন সামরিক কর্মচারীরা সবুজ আর ধুসর জামা পরেছেন, উলের বুনানো র‍্যাপার গায়ে দিয়ে সংবাদদাতাদের ভিড় চারদিকে। র‍্যাডিয়েটর দিয়ে আসছে গরম হাওয়া। বাইরে এখন তুষার ঝড় বইছে। ক্ষ্যাপা হাওয়া তুষার মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ভলগার উপরে, আর আকাশে অদৃশ্য চাঁদের আলোয় চারদিক উদ্ভাষিত হয়ে উঠছে। একথা এখানে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না।

ভালো লাগল? জিজ্ঞেস করলাম।

খুব জোর দিয়ে বলল, সৈনিকরা শুনতে পেলে বেশ হয়। হাঁ, সোভিয়েটের এক অতুলনীয় কীর্তি।

আবার সীটে ফিরে এলাম। পেতিয়া আমার হাত ধরে আস্তে চাপ দিচ্ছিল আঙুলে।

নিনচকা, আন্দ্রে চলে গেল বলে দুঃখ হচ্ছে। আহা, সে তো দেখতে পেলে না কি করে আমরা স্তালিনগ্রাদে জার্মানদের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে

দিয়েছি। হাঁ, কাজের মতো কাজ হয়েছে বটে।

আমি তাকে সীমান্তে যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম।

শীগগিরই সময় হবে, সে বেশ জোর দিয়েই বলল।

পরিচালক তার চালনা-দণ্ড দোলালেন, প্রেক্ষাগৃহ ভরে উঠল সংগীতে, আমি যেন চলে গেলাম সেবাস্তপুলের ছোট্ট হোটেলের সেই ঘরে। বাইরে কুণ্ডালনায়া উপসাগর। আস্তে আর আমি জেগে উঠলাম, তাকালাম ছাদের দিকে ঘরের গুমোট আঁধারে সাদা ছাদ দেখা যাচ্ছে।

[বাইশ]

সূক্ষ্ম বুনোট জালের মতো ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাদে। মাঝে মাঝে তারই উপর খুদে খুদে ছায়া পড়েছে। মুগ্ধ হয়ে ছাদের উপরের এই ছায়া বহুক্ষণ ধরে দেখলাম। কিসের ছায়া ভাবছিলাম।

আন্দ্রেইসা, এগুলো কি? আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম। সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাল, কোমল, ধুসর তার চোখ।

পদার্থবিজ্ঞানে একে বলে 'ক্যামেরা অবস্‌কিওরা'। কখনো শোন নি? ওর গম্ভীর স্বর শুনতে এত ভাল লাগছিল, ওর কাঁধের উপর গাল চেপে ধরলাম।

পদার্থবিজ্ঞান আমিও পড়েছি, 'ক্যামেরা অবস্‌কিওরা' কাকে বলে জানি, কিন্তু নিজে বুঝতে পারলাম না কেন?

খুশি হলাম।

তাহলে এর ভিতরে যাদু নেই বল।

বাঃ, যাদু আছে বইকি, সে উত্তর দিল।

তোমার তাই মনে হয় ?

নিশ্চয়ই। কেন, আমাদের আশেপাশে যা দেখছ সবই কি যাদুর খেলা নয় ?

তোমার তাই মনে হয় ? ওর কথার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করলাম।

হাঁ, সবকিছু যাদু ! ও ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠল। ভেবে বার কর দেখি। ধর, আমি আর তুমি একটা অন্ধকার বাক্সে ঢুকে ঢাকনি এঁটে দিয়ে ভাবলাম, বাইরের পৃথিবী টের পাচ্ছে না আমরা এখানে আছি। কিন্তু প্রকৃতি তো নির্জনতা আর অন্ধকার সমর্থন করে না, এমন কি দু'জনের নির্জনতাও তার ভালো লাগে না।

আমি বুঝতে পারলাম। হাঁ, এবার বুঝেছি। ঢাকনিতে তো ছোট ছ্যাদা আছে একটা। একটা ছোট ছ্যাদার দরকার শুধু···তাই না ?

হাঁ। একটা রশ্মি ঢুকতে পারলেই হোল, আর সেই রশ্মির সঙ্গে বাইরের সবকিছু। দেখ কি অবাক কাণ্ড ! এ যে ক্রস্তালানায়া উপসাগরের জীবন্ত ছবি। খুঁটিনাটিও বাদ পড়ে নি। ছোট ছোট ঢেউ আর তার উপরে পড়েছে সূর্যের কিরণ।

যেন জীবন্ত মর্মর, বললাম।

মিলনের প্রথম ভোরে কি ভালই লাগছিল। ওকে আন্দ্রুইশা বলে ডাকতে আর ওর কাছ থেকে নিনা এই ডাক শুনতে ভারি ভাল লাগলো। ওকে যাতে আরো এ নাম ধরে ডাকতে পারি, ক্যামেরা অবস্কিওরা নিয়ে নানা প্রশ্ন করলাম। কতই গম্ভীর ভাব, তাই মনে হোল, ওকে যেন ওবিষয়ে আমি মস্ত পণ্ডিত ঠাউরেছি।

আন্দ্রুইশা, ঐ যে ঘুরছে ওটা কি ?

কোন্‌টা ? ঐ খুদেটা ?

হাঁ, ঐ যে ছোট ছোট পা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছায়াটা ?

চিনতে পারছো না ?

না তো, আন্দ্রেইশা !

ভাল করে তাকিয়ে দেখ, নিনা।

আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। জিনিসটা যেন খুবই চেনা। বিশেষত ওর চলা, জলজলে থাবা ফেলে ফেলে এগুচ্ছে অথচ ঠিক চিনতে পারলাম না।

আন্দ্রে টেরচা চোখে তাকাল, এই ! তুমি না ছাত্রী—ওটা একটা নৌ—

নৌকো ! চিনতে পেরে তখুনি চিৎকার করে উঠলাম, সত্যাই। একখানা নৌকোর মায়াময় ছায়া। ধুসর আর লাল, জলছে, নৌকোর ছায়া ছাদে বেড়াচ্ছে ঘুরে। দুজন লোককেও গলুই আর হালের কাছে দেখতে পেলাম, আবছা কতগুলো উজ্জল শুভ্র ছায়া চলে গেল, চিনতে দেরি হোল না। গাঙচিল উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হোল, ঘর ছেড়ে রৌদ্র-স্নাত সমুদ্রের ধারে চলে গেলে হয়।

আন্দ্রে যেন মনের কথা টের পেয়ে বলল : সাঁতরাবে নাকি ?

নিশ্চয়ই। আর দেরি নয়। সারাদিন শুয়ে থাকলে চলবে না।

সুপ্রভাত, আন্দ্রে বলল।

সুপ্রভাত।

চোখে চোখে চাওয়া, তারপর উত্তপ্ত চুম্বন।

তখনি বাজনা আমাকে নিয়ে গেল সামরিক-সজ্জায় সজ্জিত মস্কৌতে। বাড়ির উপরে ছদ্ম আবরণ ঢাকা, কত না তার রং—নীল, রক্তের মতো লাল, কালো, একটা দেখলাম কিউবিক পদ্ধতির চিত্র যেন।

আন্দ্রে আর আমি হাত ধরাধরি করে চলেছি পথে। বরফ-ঢাকা পথ, এখনো পরিষ্কার করা হয় নি। বেয়াল্লিশের জানুয়ারী। আমরা জানতাম

না, মস্কৌতে আমাদের দুজনের বেড়ানোর এই শেষ দিন। মস্কৌ থেকে জার্মানরা হটে গেছে, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের প্রথম বিজয়ের সুখের দিন কেটে গেল।

কিন্তু এখনও অবরোধের চিহ্ন মস্কৌর চারদিকে, এখনো ভয়ংকর ছাপ রয়ে গেছে। শহরের বাইরে শীতের ভোরের পটভূমিতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধের কালো রঙের চিকে দেওয়া প্রাকার রয়েছে, তার উপর লেগে আছে বরফ। ক্রেমলিনের বাইরের দেয়ালে জানালা আর গাছের সার আঁকা। বলশয় থিয়েটারের তোরণে বোমা পড়েছিল, সেখানটা রোমিও জুলিয়েটের একখানা প্রকাণ্ড দৃশ্য দিয়ে ঢাকা। ইতালীয় চঙে স্তম্ভ আর ঝরণা আঁকা। সাদা রঙ করা ট্যাঙ্কের সার চলেছে গোর্কি ষ্ট্রীট দিয়ে। সাদা রঙ করা গাড়ি আসছে সীমান্ত থেকে, হাওয়ার আবরণ বুলেটে চৌচির, মাড্‌গার্ড দলে মুষ্‌ড়ে গেছে, পাগলের মতো চলেছে রাস্তা দিয়ে। পেট্রলের গন্ধে হাওয়া ভরপুর।

তাড়াতাড়ি এল আঁধার। আস্ত্রের কোটের কলার নিশ্বাসে সাদা।

নিনা পেত্রভ্‌না একখানা গাড়ি আসতে দেখে বলে উঠল, ঐ গাড়িখানা বোধ হয় আমাকে নিতে এল।

সে ঘাস থেকে উঠে কর্ণেলের জোব্বাটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দিন প্রায় হয়ে এল। আকাশ ছোট ছোট মেঘে ভরা, উষার আর দেরি নেই। নিনা পেত্রভ্‌না একখানা ছোট গাড়ির কাছে গেলেন, দরজা খোলা গাড়ির। বিমান-বিভাগের নীল ফিতে দেওয়া টুপি পরা একজন মেজর মুখ বার করে আছে, সোনার তারকা তার কোটে আঁটা। তার মুখখানা তামাটে, মুখে গোঁফের সরু রেখা।

নিনা পেত্র্‌ভনা, সে চিৎকার করে ডাকল।

আচ্ছা, বিদায়! নিনা পেত্র্‌ভনা হাত বাড়িয়ে দিলেন। মেজর

লাভুশকিন আমার জন্ম অপেক্ষা করছেন। এতক্ষণ সঙ্গে ছিলেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে কর্ণেলের জোব্বাটা ফেরত দেবেন। আবার হয়তো দেখা হবে।

তিনি গাড়ির কাছে গিয়ে নিজের ব্যাগটা রাখলেন গাড়ির ভিতরে, তারপর উঠে বসলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।

শীগগিরই আবার আমাদের দেখা হোল।

[তেইশ]

প্রথমে আমরা নুয়ে নুয়ে চলছিলাম, এবার হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম। ঘন সরষে গাছগুলো সাবধানে সরিয়ে দিচ্ছিলাম আমরা। যুদ্ধক্ষেত্ররক্ষী সৈন্যদের প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দেখতে পেলাম।

ক'জন লোক খড়ের গাদা বিছিয়ে তার উপর শুয়ে আছে; একজন কশাকের মুখে কাদা মাখা। একটা অ্যানটি-ট্যাঙ্ক কামানের লম্বা আর সরু নলটার পাশে শুয়ে, সবার চারদিকে ছদ্ম আবরণ। কেউ কেউ বা শিরস্ত্রাণের উপর খড় বেঁধে নিয়েছে, কেউবা সারা গায়ে জড়িয়েছে জাল, জালের সঙ্গে সুতো দিয়ে ঘাস সেলাই করা। তাদের দেখে জাপানী জেলে বলে মনে হয়।

কাল জার্মানরা এখানে ছিল। রাতেই তারা নিঃশেষ হয়েছে। তাদের জায়গা দখল করেছে একদল রাইফেলধারী সৈন্য, কামানের গোলা প্রতিরোধের অভেদ্য বর্ম তাদের গায়ে। তারা পদাতিক-বাহিনীর জন্ম অপেক্ষা করছে। জেনারেল তাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছেন দেখে, তারা উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় জেনারেল নিষেধ করলেন। জেনারেল হাঁটু গেড়ে বসে সরষে গাছগুলো সরিয়ে ফিল্ড গ্লাস নিয়ে দেখতে

লাগলেন জার্মানরা কোথায় আছে।

আমাদের থেকে জার্মানদের অবস্থিতির স্থান সিকি মাইল দূরে। এই সিকি মাইল আজাদ এলাকা।

আমাদের পদাতিক-বাহিনী কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম।

ঠিক এসে যাবে এখন, জেনারেল ফিল্ড-গ্লাস না নামিয়ে বললেন। জেনারেল একজন গোলন্দাজকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। সে হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এল। দুজনে মিলে দূরবীন কষে শত্রুর অবস্থিতির স্থান দেখতে লাগলেন। তাদের দৃষ্টি তখন বহুদূরের যব খেতের ওপারের একটুকরো জমির উপর। দূর থেকে জমিখানাকে ছাপা কালিকো কাপড়ের মত দেখাচ্ছে।

জেনারেলের মতে ওখানে একদল সৈন্য রয়েছে, গোলন্দাজটিও তার সঙ্গে একমত ; গত পরশু ওখানে আরো দুটো কামান নিয়ে গেছে ওরা।

মানচিত্রখানা দাও, জেনারেল মুখ ফিরিয়ে হাত বাড়ালেন। সহকারী হামাগুড়ি দিয়ে এসে তোয়ালের মতো ভাঁজ করা একখানা মানচিত্র তার হাতে দিল। মানচিত্র দাগে দাগে ভরা।

জেনারেল ম্যাপখানা ধুলোয় পেতে নিলেন। সরষে ঝরে ঝরে মাটিতে মাদুরের মতো তৈরী হয়েছে, তারই উপব রাখলেন মানচিত্রখানা। এবার বসে গেলেন দেখতে, তন্ময় হয়ে গেলেন।

চারটে বিস্ফোবক বোমা ফেলুক ওখানে, তিনি বললেন, তাতেই কাজ হবে।

হুকুমেব পুনরাবৃত্তি হোল : চাবটে বিস্ফোবক বোমা। গোলন্দাজ তার পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটিতে ফিরে চললো। এই ঘাঁটিতে আছে এরিয়েল, তাতে তিনটে পাও আঁটা, হঠাৎ দেখলে কৃত্রিম তালগাছের চারা বলে মনে হয়।

কোথায় যেন পৎ পৎ শব্দ হোল।

মাইন, কে যেন নিচু গলায় বললে।

হঠাৎ কানে তালা লাগানো এক বিস্ফোরণ। আমাদের কানের পর্দায় লাগল ধাক্কা। আমরা যে জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম, তারই উপর দিয়ে গোলার টুকরোগুলো শিস দিতে দিতে চলে গেল। সরষের ছড়া আর ফুল ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ল। দম আটকানো ধোঁয়ায় ডুবে গেছি। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ধোঁয়া, একগোছা চুল যেন সরষে গাছের মোটা চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে কেউ। বারুদের কটু গন্ধ, কার্ডবোর্ড জলছে, গ্রীষ্মের দিনে পার্কে বাজি পোড়ানোর পর এমনি গন্ধ পাওয়া যায়।

সবাই বেঁচে আছো? জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন।

হাঁ, একসঙ্গে বিভিন্ন স্বরে এল উত্তর।

কিন্তু তোমাদের ছদ্ম আবরণ স্থবিধের নয়, ভীষণ স্বরে বললেন জেনারেল, তাছাড়া কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না, হামাগুড়ি দিয়ে চল। বুঝলে? গর্ত খুঁড়ে নাও। এমনিভাবে খুঁড়বে যেন আশেপাশের সবকিছু দেখা যায়।

দেরি না করে সৈন্যরা শুয়ে পড়ে ছোট বাটওলা শাবল দিয়ে শুরু করল গর্ত খুঁড়তে। বাধা এল তখুনি। দুটো মাইন মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আমাদের কিছুদূরে পড়ে ফেটে গেল, খুঁড়িয়েদের চারপাশে সরষে গাছগুলো গেল সমভূমি হয়ে, ব্যাচেলার বাটন আর ডেইজির ছিন্ন পাঁপড়ি উৎক্ষিপ্ত হোল শূন্যে।

আমাদের খুঁজছে ওরা, কে একজন বলে উঠল।

কিন্তু খুঁজে পাবে না। গ্রীস্‌কা, ওরা লড়াইয়ের ছক মাফিক চলছে, জেনারেল তার হালকা টুপিটা পেছন দিকে টেনে দিয়ে মানচিত্র দেখতে দেখতে বললেন। চিরাচরিত কৌশল ধরেছে। আমাকে পেরিস্কোপটা দাও তো।

জেনারেলের হাতে তখুনি একটা ছোট পেরিস্কোপ দেওয়া হোল।

তিনি গুঁড়ি মেরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেন। আমার তো মনে হোল, বুঝি বা জার্মানদের এলাকায় গিয়েই পড়েন, এবার তিনি শুয়ে পড়লেন, নড়া চড়া নেই—শুধু পেরিস্কোপের সবুজ রং-এর ডাণ্ডাটা সরষে গাছগুলোর উপর দেখা যাচ্ছে।

আর একটা মাইন উড়ে এল, তারপর আরো দুটো। যতক্ষণ না আমাদের দিক থেকে পাল্‌টা আক্রমণ শুরু হোল, ততক্ষণ মাইনের পর মাইন ছুটে চলল আমাদের উপর দিয়ে। এখানে ওখানে, ডানে বাঁয়ে ফাটছিল, আমরা ভ্রূক্ষেপও করিনি। আমরা জানতাম, জার্মানরা এলো-মেলো আক্রমণ চালাচ্ছে। আশা, যদি হঠাৎ লেগে যায়।

জেনারেল এবার টেরাই পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎ শত্রুর ট্যাঙ্ক এসে পড়লে কি করতে হবে তা বলে দিলেন। তারপর কখনও-বা হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও নুয়ে পড়ে তিনি পাশের লবঙ্গ ক্ষেতে গিয়ে হাজির হলেন। এখানে আগেই অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর ঘাঁটি তৈরী ছিল।

এমন কিছু নয়। সাধারণ একটা খাত, সেখানে একজন টেলিফোন অপারেটর বসে আছে, হেডফোন পরা, ঘাম ঝরছে, ট্যাঙ্কবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

জেনারেল তাকালেন হাতের ঘড়ির দিকে। আক্রমণের আর পনের মিনিট বাকি। সব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, স্বাভাবিক বলতে এই বুঝায় যে, দু'পক্ষের গুলিবর্ষণের বেগটা বাড়েনি।

নানা মারণাস্ত্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

পিছনে গুলির শব্দ তাল গোল পাকিয়ে কেমন একটা সংক্ষুব্ধ গর্জনের সৃষ্টি করছে, সে শব্দ ভীতিজনক তো বটেই, অসহ্যও বটে। কিন্তু আমরা যারা দুই এলাকার মাঝখানে তাদের কাণে বিভিন্ন মারণাস্ত্রের বিভিন্ন গর্জন

বাজছে, আমরা এই বিভিন্ন গর্জনের বিভিন্ন অর্থ, এর মিলিত সঙ্কেত বুঝতে পারছি, কি ফল তাও জানি। 'নিরীহ' শব্দের প্রবাহ জোরালো হয়ে উঠলেও তার মূল্য গৌণ; কৌতূহলী সে করতে পারছে না, এখন 'হিংস্র' শব্দের সমারোহ নিয়েই কারবার। আমাদের চেতনায় তারা জ্বল জ্বল করছে।

জার্মাণরা ভারি ওজনের বোমা বহু উপর থেকে ঘন ঘন পাশের পথের উপর ছুঁড়ছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই বলেই আমাদের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ভয়ও নেই—যদিও দূরে তারই বিস্ফোরণের ফলে উঠছে বিরাট কালো ধোঁয়ার মেঘ স্তর—অশুভ তার সংকেত। কানের পাশ দিয়ে ছুটছে গুলীর পর গুলী প্রতিমুহূর্তে, কিন্তু সেদিকেও আমাদের খেয়াল নেই; যদিও বিরক্ত লাগছে। অন্যদিকে অবিরত কানে এসে বাজছিল মাইনের আগমনী-সংকেত—মাইন ফেটে পড়বার দু-এক সেকেণ্ড আগে শুনতে পেয়ে সৈন্যরা কেউ বা উবু হয়ে শুয়ে পড়ছিল, কেউ-বা খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ মেসারস্মিটের ছায়া অলক্ষ্যে আমাদের উপর এসে পড়ল। একটা ঝলকানি যেন। চলমান মেসারস্মিট, কালো আর হলদে রঙ, বোলতার মতোই ডোরা-কাটা, আমাদের উপরে উঠে এসেছে, আমাদের প্রান্তরের উপর দিয়ে এবার সে উড়ে যাবে, তার প্রতিটা কামান থেকে উগরে দেবে গুলী, ধুলোর ফোয়ারা উঠবে একটার পর একটা।

মাঝে মাঝে আকাশে ছায়া দেখা যাচ্ছে, মেঘ বলে মনে হচ্ছে, আসলে সে মেঘ নয়, তিনটে বা ছ'টা বোমারু বিমানেরই ছায়া। আমাদের উপরে এবার ওরা ছোঁ মারবে।

সূর্যের কড়া রোদ, ওদের চিনতে কষ্ট হচ্ছে। আমাদের, কি শত্রুর কে জানে। চিনবার জন্য সবাই তাকাচ্ছে, চোখে লাগছে আলো। আশাবাদীরা বলছে: আমাদেরই বিমান!

আবার দুঃখবাদীর নিরাশাও বিদ্রূপ হয়ে ঝরে পড়ছে! আমাদের

তো বটেই, তবে জার্মান বোমা ফেলছে।

হঠাৎ আকাশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ট্রেঞ্চগুলো পর্যন্ত যেন গুঁড়িয়ে যাবে। আমরা এবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ব। আমাদের গলায় মাটির টুকরো এসে লাগছে, মাথার টুপিতে ঠিকরে পড়ছে। ঘাস আর ধুলোয় ভূত হয়ে গেছি।

বহুক্ষণ ফিল্ডগ্লাস নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে জেনারেল ট্যাঙ্ক-বাহিনীকে ফোনে খবর দিতে হুকুম দিলেন। যুদ্ধের পরিস্থিতি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, হয়তো আর পাঁচ মিনিটের ভিতরেই একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটবে।

কেমন মনে হচ্ছে? তিনি আমাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন।

দুটো ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষরা ফোনে উত্তর দিল, কিন্তু তৃতীয়ের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তার সহকারী উত্তর দিল।

আমি সহকারীর উত্তর শুনতে ডাকিনি, আমি অধ্যক্ষকে চাই, জেনারেল কড়া স্বরে বললেন।

আমি চার নম্বরের কমরেড। ২৫নং ফোনের কাছে আসতে পারছেন না।

কেন?

মুখে মেখেছেন।

কি মেখেছেন?

সাবান মেখেছেন। দাড়ি কামাচ্ছেন। আমাকে জানিয়ে দিতে হুকুম দিলেন, সব তৈরী। আর তিনি মিনিট তিনেকের মধ্যেই দাড়ি কামিয়ে আসছেন। আপনি কি কামাতে বারণ করছেন, না, তিনি কামিয়ে আসবেন?

একটু ভেবে জেনারেল বললেন, আচ্ছা, দাড়ি কামিয়েই তিনি আসুন।

[চব্বিশ]

এবার একদল পদাতিক সৈন্য উপত্যকা থেকে পাহাড়ের উপর উঠে এল। আমাদের দিকেই তারা আসছে। এরা রক্ষী দল, সার বেঁধে আসছে ফুলে-ভরা লবঙ্গ ক্ষেতের ভিতর দিয়ে। সবুজ হেলমেট পরা, ষ্ট্র্যাপ দিয়ে চিবুকের সঙ্গে আঁটা করে বাঁধা, ছদ্ম আবরণের আঙরাখা আর জাল সারা গায়ে, তারা এগিয়ে এল বীরদর্পে ওরেলের উপর দিয়ে, কারো হাতে মেসিনগান, কারো হাতে বা মাইন ব্যর্থ করবার টিউব, কারো হাতে বা গোলা-বারুদের বাক্স, মাইন, কারো হাতে রাইফেল, ঘোড়ার উপর হাত দিয়ে চলেছে, দলটা যাচ্ছে আগে আগে।

শুয়ে পড়, শুয়ে পড়! একজন পদস্থ তরুণ কর্মচারী চেঁচিয়ে উঠলেন, একেই আমি কাল সাঁজোয়া গাড়ির ছাদে দেখেছিলাম। এখন তার মুখে ধুলো মাখা, চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। ঘামে ভেজা সার্টে সামরিক সম্মান-চিহ্ন আঁটা।

ওরা তার কথা শুনলনা।

শুয়ে পড়! হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোও!

আমাদের ব্যবধানের ভিতরে এবার ক'টা মাইন ফাটলো। ওরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কেউ মাটিতে শোয়নি। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। প্রায় ছুটছে। আমাদের ভিতরের ব্যবধান আসছে কমে। ওরা এবার ফুলে ভরা পাহাড়ের ঢালু জায়গায় এসে পড়ল, ওরেলের আকাশের প্রজ্জ্বলন্ত পটভূমিকায় ওদের দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মেঘের খেলা চলছে সেখানে।

ঈগল! রক্ষীবাহিনী! জেনারেল প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমাদের পাশে এসে ওরা দাঁড়িয়েছে, আমাদের ভিতর দিয়েই ওরা এগিয়ে চলল শত্রুর দিকে। এবার এগিয়ে গিয়ে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ওখান থেকে ওরা প্রতিরোধকারী ঐ বর্বরদের আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, জেনারেল বললেন। গোলন্দাজ, বিমানবাহিনী আর পদাতিক দল জার্মাণ প্রতিরোধ ভেঙে দিচ্ছে, এবার সেই ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে চলবে ট্যাঙ্ক···তাই তো, জেনারেল বললেন, আপনারা যারা ট্যাঙ্কের যুদ্ধ দেখতে এসেছেন, তাদের আমি পদাতিকবাহিনীর সারে রেখেছি। আমার অবশ্য এখানে থাকবার কথা নয়, আমি থাকব পেছনে। আচ্ছা···

আমি কথা বলবার সময় পেলাম না, জেনারেলের হাতঘড়ির কাঁটাটা এরই মধ্যে সম্ভাবনাময় ক্ষণে এসে পৌঁছেছে।

গোলাগুলী মাথার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে পশ্চিমে। ফিল্ড্-গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখলাম, জার্মাণ সেনাদল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কি যেন একটা ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ে ফেটে গেল। ঘূর্ণি উঠছে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরো-গুলো কালো বর্ষাধারার মতো পড়ছে, আবার মাটি থেকে আকাশে উঠে আসছে।

এবার এল পদাতিক সৈন্যদল।

আমাদের দেশের জন্য, স্তালিনের জন্য! কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, কামানের গর্জন ছাপিয়ে উঠছে স্বর।

বহুক্ষণব্যাপী হর্ষধ্বনি কানে আসছে।

ঈগলের দল, এগিয়ে চল! জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন।

টেলিফোন-অপারেটার তার ছোট্ট ট্রেঞ্চ থেকে খবর পাঠাচ্ছে, ভাঙা স্বর, কিন্তু আনন্দের রেশ বাজছে, কমরেড দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষ

খবর দিচ্ছেন, শত্রুকে হটিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা এখন ছিন্নভিন্ন।

জেনারেল ফিল্ড-গ্লাস থেকে চোখ না তুলেই বললেন, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! কমরেড লেখক, কখনো কি জার্মানদের এমন অবস্থা দেখেছেন? দেখুন, দেখুন! দেখে আনন্দ পাবেন। তিনি ফিল্ড-গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিলেন।

দূরে ঘন ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করেছে জার্মাণ সাজোয়া গাড়ির সার, তারা কামান, রান্নার সরঞ্জাম আর ট্যাঙ্ক নিয়ে চলেছে পশ্চিমে। সামনে একটা গ্রাম জ্বলছে। আমাদের চারটে ট্যাঙ্ক একটা গির্জার কাছে দাঁড়িয়ে গুলী ছুঁড়ছে, মেসিন-গানের নলগুলি দেখা যাচ্ছে।

এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি!

চমৎকার! জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন। ঘাম মুছে ফেললেন নাক আর কপাল থেকে, গলা থেকে ঝুর ঝুর করে মাটি ঝরে পড়ল। এবার আমাদের রেল লাইনের দিকে এগোতে হবে। গাড়ি নিয়ে এস!

আমরা মাঠ ছেড়ে এবার ঢালু জায়গায় এলাম। চষা জমি পেরিয়ে চলেছি হামাগুড়ি দিয়ে। ভারি খুশি মন। মেজর-জেনারেল কাদা মাখা টুপি দেখে হঠাৎ টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' আর ব্যাগ্রেশনের কথা মনে পড়ল। জমির উপর দিয়ে চাষীর মতোই যেন চষতে চষতে চলেছেন।

[পঁচিশ]

আগের দিনের অধিকৃত গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম পরদিন। রাত্রে বেশ বৃষ্টি পড়েছে। আগুন নিবে গেছে, গ্রাম একেবারে পুড়ে যায় নি। কিন্তু পথে চলা শক্ত। হাল্‌কা ট্রাকের চাকা পিছলে যাচ্ছে, ওয়েলের কাদায় চলাই শক্ত। প্রতি তিরিশ গজ অন্তরই ড্রাইভার নেমে

কাদা থেকে শাবল দিয়ে খুঁড়ে চাকা তুলছে। কখনো-বা খুঁড়েও লাভ হচ্ছে না। এবার আসনের পিছন থেকে কুড়ুল দিয়ে পথের উপরের ঝোপঝাড় কেটে কাদা-জল-ভরা গর্তের উপর ফেলে দিচ্ছে, এতে চলবার সুবিধেই হবে। গ্রামের বাইরে ঢালু একটা জায়গায় এসে থামল গাড়ি। এখানে শাবল বা কুড়ুলে কুলালো না। ট্রাক কাদায় বসে গেল।

ড্রাইভার যখন তক্তার খোঁজ করছিল আমি পা টান করবার জন্য নেমে পড়লাম। ঢালু জায়গাটার কাছে গিয়ে দেখলাম—ও পাশের সরষে ক্ষেত গত রাত্রের বর্ষায় নুয়ে পড়েছে। তার উপর দিয়ে ট্যাঙ্কের যাতা-য়াতের চিহ্নও রয়েছে। একটা ইঁটের বাড়ি দেখতে পেলাম, গ্রামের গির্জা, তার চারদিকে উঠোন! এবার চিনতে পারলাম, জেনারেলের ফিল্ড-গ্লাসে এই গির্জাটিই দেখতে পেয়েছিলাম আগের দিন। তারপর যুদ্ধ-সীমান্ত পশ্চিমে আরো এগিয়ে গেছে। জার্মানরা এখনো পিছু হটছে। দূরে এখনো তাদের গাড়ির অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়া যেত ; কিন্তু ঝোড়ো মেঘ এখনো আকাশে, তাই তেমন কানে আসছে না। তবুও দূর থেকে ঝড়ের সংক্ষুব্ধ গর্জনের মতোই মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে। ঝড় যেন ছুটে চলেছে, দূরে বহুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দু-দুবার সূর্য, মেঘস্তরের ভিতর দিয়ে দেখা দিল, কর্দমাক্ত পথ-রেখা ঝলসে উঠল পারার মতো। সূর্যের আলোয় দিন যেন একটু সজীব হয়ে উঠেছে।

একজন প্রহরী রাইফেল হাটুর ভিতর চেপে একখানা কুঁড়ে ঘরে বসে আছে, তার হাতে রক্ষীর ব্যাণ্ড বাঁধা। দেখলে মনেই হবে সে বুঝি সরষে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে। কেমন শান্ত ভাব।

সরষে ক্ষেতের ভিতরে লোক চলছে। পরিচিত নীল কোটের সংকেত। নিনা পেত্রভ্না না? বড় বড় গাছগুলো হাঁটু দিয়ে সরিয়ে

চলেছেন। হাতে বুনো ফুলের একটা তোড়া, তার উপরে একটা প্রজাপতি এসে বসেছে, পাখাদুটি তার বোজানো। তিনি স্নান করে এসেছেন, সুন্দর চুল আঁচড়ানো। এবার তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখছি। তিনি সুন্দরী, কৃশ সুন্দরীর পবিত্রতা আর ঔজ্জ্বল্য তার আছে, আছে বুদ্ধির প্রখরতা, আত্মা আর দেহ-সৌষ্ঠব। তার ধূসর চোখে মনেরই ছায়া টলমল করছে। স্বপ্ন তার সার্থক, তারই কৃতজ্ঞতায় চোখদুটি আবেশময় হয়ে উঠেছে।

তাকে ডাকলাম। তিনি চমকে উঠলেন, লজ্জার লালিমা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। তিনি হাসলেন, সহজ হাসি, কিন্তু ঠোঁটের কোনে বুঝি সে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। তারপর বললেন, আমার সঙ্গে আসুন।

গির্জার পাশ দিয়ে চললাম, একটা দিক ধ্বসে গেছে। ইটের দেয়াল ভেঙে গেছে, তারই ভিতর দিয়ে আইকন দেখতে পেলাম। তার চারপাশে প্লাসটার ভেঙে ভেঙে পড়েছে, আমরা ভাঙা জায়গাটার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, একঝাঁক খুদে পাখী গির্জার ভিতর থেকে উড়ে এসে একটা বার্চ গাছের উপর বসল। বার্চ গাছটা গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েও কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাতাগুলো এখন সবুজ আর সতেজ। পাখীর ঝাঁক পাতার ভিতর গিয়ে লুকাল।

গির্জার ঠিক একপ্রান্তে ছোট্ট কবরখানা, তারই ধারে বিমানবাহিনীর ক'জন কর্মচারী একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুদিনের কবর, তারই উপর তক্তা কেটে বসানো হয়েছে। কর্মচারীদের ভিতর মেজর সাভুসকিনকে দেখলাম।

নিনা পেত্রভ্না আমাকে কবরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই সেই কবর।